বরফের কফিন

বীতশোক ভট্টাচার্য

বাণীশিল্প

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৬১
প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর
রাধাবল্লভ মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হিরণ মিত্র

বাপি ও মিঠুকে

—দাদা

পুরনো দিল্লীর পূর্ব্ব শহরতলী ঘেঁষে একটা ঘন আবাসিক অঞ্চল। এখন গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। টিমটিমে আলোর তলায় ফেরীওয়ালাদের ঠেলাগাড়ী, স্কুটার, রিক্স, লোকের ভিড় কাটিয়ে একটা জিপ মন্থর গতিতে ঢুকলো উত্তর দিকের সরু রাস্তায়। এখানে পুরনো ধরনের সব ঘর বাড়ী। ছোট বড়। লম্বা চৌকো। নানা রকমের গড়ন। তবে বেশীর ভাগ ভাঙ্গা-চোরা। এরকমই এক ঝরঝরে দোতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল জিপটা।

জিপের স্টিয়ারিং ছেড়ে নামলো এক যুবক। ওপাশের দরজা খুলে আরও দুজন। তিনজনই মোট আরোহী গাড়ীটার। প্রত্যেকেই প্রায় সমবয়সী। পোশাক সবার মোটামুটি এক। জিনের চোস্ত প্যাণ্ট, হাফ স্লিভ নক্সা-কাটা পলিয়েস্টারের গেঞ্জি। শুধু গাড়ীর স্টিয়ারিং থেকে যে নামল তার গায়ে গেঞ্জির ওপর বড় বড় সোনালী বোতাম লাগানো জ্যাকেট। ছেলেটির স্বাস্থ্য অন্য দুজনের চেয়ে অনেক ভাল। তার মাথায় ফরাসী কায়দায় কাটা ছোট ছোট চুল। চোখ দুটো সরু কিন্তু অসম্ভব জ্বলজ্বলে। ঐ চোখে আছে প্রচ্ছন্ন একটা পৈশাচিক ভাব। যেটা গভীর দৃষ্টিতে না তাকালে ওর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক, কেতা-দুরস্ত হাঁটা চলা ও কঠিন গাম্ভীর্যের মধ্যে নজরে পড়ে না। ওর নাম ডেভিড। অন্য দুজন যারা ওকে অনুসরণ করে দোতলা বাড়ীটার বারান্দায় উঠল তাদের গড়ন ছিপছিপে। প্রথম জনের চেয়ে এরা বেঁটে। এদের মধ্যে একজন কালো। আর একজন ফর্সা। ওদের নাম যথাক্রমে রাজ ও গুলসন।

এরা তিনজন একটি কুখ্যাত দস্যু দলের সদস্য।

স্বাস্থ্যবান ছেলেটির মৃদু কড়া নাড়ার মিনিট খানেকের মধ্যে সামনের দরজাটা খুলে গেল। পাজামা কুর্তা পরা একটি মাঝ বয়েসী চাকর ওদের ঢুকিয়ে নিল ঘরে। দরজা বন্ধ হল। ভেতরে ছড়ানো ছেটানো চেয়ার বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল ওরা। চাকরটা উঠে গেল ওপরে।

এই বাড়ীর মালিকের নাম প্রেমনাথ বহ্‌ল। তার পরিচয় এখানে, নতুন দিল্লীর একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসাবে হোলেও আসলে সে এই কুখ্যাত দস্যুদের নায়ক যার সদস্য এই তিনজন যুবক। নতুন দিল্লীতে তার সত্যি-কারের দু'টো কাপড়ের দোকান আছে। আর এই বাড়ীটা হল সেই কাপড়ের গুদাম। কিন্তু এ সবই প্রেমনাথের সভ্য সমাজে থাকার মুখোশ মাত্র। এই মুখোশের আড়ালে এই জঘন্য প্রবৃত্তির লোকটি তার দল মারফৎ বিভিন্ন অসৎ উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে। তার এই দু-নম্বর পেশায় আছে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, স্মাগলিং, চোরাই জিনিসের কেনা-বেচা এমনকি টাকার বিনিময়ে খুন খারাপি পর্য্যন্ত।

ডেভিড হল প্রেমনাথের এই গোপন দলের এক নম্বর কর্মী। বলতে গেলে ওর ডান হাত। প্রেমনাথ যেমন তুখোর ধুরন্ধর ও নিষ্ঠুর, ডেভিডও তেমনি চৌখস, তৎপর ও নির্দয়। ডেভিড শিক্ষিত। এককালে সে সভ্য সমাজে ভদ্র কাজই করত। কিন্তু ওর কুটিল শয়তান মন সে কাজে ওকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখেনি। এখন সে ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। ওর অতীত কু-কীর্তির মধ্যে আছে তিনটে মারাত্মক ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও পাঁচটি নৃশংস খুন। শুধু ওর অসম্ভব তৎপরতা ও কূটবুদ্ধির জোরে এখনও সে পুলিসের নাগালের বাইরে।

রাজ ও গুল্‌সন এই দলের দ্বিতীয় সারির কর্মী। ওদের মাথায় বুদ্ধির একটু ঘাটতি আছে। তাহলেও কোন অপরাধমূলক কাজে সাহায্যকারী কর্মী হিসেবে দু'জন বেশ পারদর্শী। ছিপছিপে হলেও ওদের গায়ের শক্তি অসীম। পুলিসের চোখকে ধুলো দিয়ে পালাতে ওদেরও কোন জুড়ি নেই। তবে মগজটা একটু দুর্বল বলে ওরা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারে না। কাজ করানোর জন্য ওদের ওপর চাই একজন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক। এবং সেই লোকটি যদি ডেভিড হয় তাহলেই ওরা খুশি।

কিছুক্ষণ পরেই চাকরটা এসে জানাল, ওদের ওপরে ডাকা হয়েছে। ডেভিড প্রথমে উঠে দাঁড়াল, তারপরে রাজ ও গুল্‌সন। ওরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

দোতলায় কোণের ঘরে একটা মাঝারি টেবিলের ওপর ঝুঁকে একাগ্র মনে কিছু লিখছিল প্রেমনাথ বহ্‌ল। ওরা ঢুকতেও সে মুখ তুলে তাকাল না।

প্রেমনাথের বয়স প্রায় চল্লিশ। লম্বা, স্বাস্থ্য সুঠাম। চোখে মুখে মেদের ছাপ সুস্পষ্ট। থ্যাবড়া নাক কিন্তু চোখ দুটো তীক্ষ্ণ। তাতে কর্তৃত্বের আভাস আছে। জ্বলন্ত সিগারেটটা মুখে নিয়ে সে তখনও আপন মনে লিখে চলেছে। ওরা তিনজন সামনের চেয়ারটায় বসল।

প্রেমনাথ বহ্লের টেবিলে ওর লেখার কাগজপত্র ছাড়াও রয়েছে আরও নানারকমের জিনিষ। ওর বাঁদিকে টেলিফোন, একটা হলদে শেড লাগানো টেবিল ল্যাম্প, দুটো পেপারওয়েট ও কাচের অ্যাসট্রে। ডানদিকে চার-পাঁচটি ফাইল, তার পাশে দুটো ছোট প্রোজেক্টার। একটা ছবির স্লাইড ও আরেকটা এইট মিলিমিটার ফিল্মের জন্য।

ডেভিড একটু উসখুস করল। পকেট থেকে লম্বা বিদেশী প্যাকেটটা বার করে একটা সিগারেট ধরাল। ডেভিড ভাল করেই জানে, এ মুহূর্তে ওদের কিছুক্ষণ বসতে হবে। প্রেমনাথের এটাই স্বভাব। কোন বিশেষ কাজের জন্য ওদের তলব করে সেই কাজের পুরো ফিরিস্তি শোনাবার আগে সে নিজে ব্যস্ত হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। কাজের গুরুত্ব ও জটিলতা অনুযায়ী তার ব্যস্ততা ও গাম্ভীর্য হয়ে ওঠে তীব্র থেকে তীব্রতর। ডেভিড এও জানে আজ ওদের যে কাজের জন্য এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে সেটা অত্যন্ত জরুরী ও বেশ দুরূহ। দিন চারেক আগে প্রেমনাথের কাছ থেকে এর কিছুটা আভাস সে পেয়েছে। যার জন্য ওদের তিনজনের একমাস আগে ঠিক করা দুদিন আগের ব্যাঙ্কক যাওয়া বাতিল হয়ে গেল। শুধু কি তাই? এই কাজকে কেন্দ্র করে প্রেমনাথ গত এক সপ্তাহ বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। তার মধ্যে শেষ চারদিন ছিল সে পুরোপুরি অজ্ঞাতবাসে। কি এমন সে কাজ, যার জন্য এত গোপনীয়তা, এত প্রস্তুতি? যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলের আরও বহু লাভজনক কাজ মুলতুবি রাখা হল? ডেভিড স্বভাবতই বেশ উদগ্রীব। সিগারেটের ঘন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অধীর আগ্রহ নিয়ে সে ভেতরে ভেতরে উসখুস করতে লাগলো।

প্রেমনাথ প্রায় মিনিট পনের পরে সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। হাতের ...ম পাশে রেখে কাগজপত্রগুলো একে একে গুছিয়ে রাখল নিপুণভাবে। ...রপর মুখের সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল।

—চারদিন আগে শেষ কথা হল তোমার সঙ্গে। ডেভিডের দিকে তাকিয়েই শুরু করল প্রেমনাথ। ওর ভরাট গলা। কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ, কাজটা কি ধরনের? কোথায় এর এলাকা হতে পারে?

—না। ডেভিড চোয়ালে হাত ঘসল। নতুন ও জটিল কিছু হবে, এটুকুই আমি জানি। আর কোন সূত্র সেদিন পাইনি তোমার কাছ থেকে।

—একটা সূত্র ছিল। প্রেমনাথ ঝুঁকে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে বললো একটু খেয়াল কর। সেদিন আমি তোমায় একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, সিমলায় থাকতে কলেজের ল্যাবরেটরী-অ্যাসিস্টেন্ট ছাড়া আর কি কাজ করেছ তুমি। তুমি উত্তরে বলেছিলে, ট্যুর গাইড। আমি জানতাম কথাটা। তবু সেদিন আরও ভাল করে যাচাই করে নিলাম। তোমার মনে নেই, উত্তরটা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। যাক, আজ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমার কাছে—বরফে ঢাকা কোন উঁচু পর্বত শৃঙ্গে চড়েছ কখনো?

ডেভিড তখনই উত্তরটা দিল না। বুঝল কিছু। কিন্তু বুঝে আরও হেঁয়ালীতে পড়ল সে। কেশে বললো, শৃঙ্গ না হলেও বরফে ঢাকা পাহাড়ী পথে বহু চলতে হয়েছে আমাকে। সিমলার আশেপাশে ডিসেম্বর জানুয়ারীতে বরফ ছাড়া আর কি থাকে? তাছাড়া মানালীতেও কিছু ট্রেকিং করেছি।

—তুমি, রাজ? প্রেমনাথের দৃষ্টি ঘুরল। পাহাড়ে উঠেছ কখনও?

—না। রাজের ছোট্ট উত্তর।

—আর তুমি গুল্‌সন?

—না। পাহাড় দেখেছি কিন্তু চড়িনি কোনদিন।

—ঠিক আছে। প্রেমনাথ চেয়ারে হেলান দিল আবার। হাত দিয়ে থুতনি ঘসতে ঘসতে বললো, ডেভিডের যখন এ ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। কাল পাহাড়ের দিকে রওনা হচ্ছ তোমরা।

—পাহাড় বলতে, কোথায়? ডেভিডের দৃষ্টি গভীর হল।

—পিণ্ডারী অঞ্চল। উত্তর প্রদেশে আলমোড়া জেলায় জায়গাটা ট্রেকারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টের জন্য মোট যাওয়া আর যাওয়া একশো কুড়ি কিলোমিটার হাঁটতে হয়।

—জানি। ডেভিড ঘাড় নাড়ল। সিমলায় থাকতে পিণ্ডারীর নাম শুনেছি। কিন্তু ওখানে কাজটা কি?

—কাজটা একেবারে অন্য রকম। প্রেমনাথের স্বর আরও গাঢ় হল। এ যাবৎ যা করেছ তোমরা তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। আমি গোড়া থেকেই শুরু করছি।—তুমি নিশ্চয়ই জান ডেভিড, এই পিণ্ডারী অঞ্চলেই হিমালয়ের বহু পর্বত শৃঙ্গ আছে। যেমন, নন্দাখাত, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, ছাঙ্গোছ—এরকম আরও অনেক। এ সব পাহাড়ের চূড়োয় উঠতে প্রায় প্রতি বছর আমাদের দেশের অভিযাত্রী ছাড়াও বিদেশ থেকে বহু দল যায় সেখানে। এরকমই একটি দল মাত্র কয়েকদিন আগে আমেরিকা থেকে এসেছিল নন্দাখাত জয় করতে। নন্দাখাত হল পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টের প্রায় ধার ঘেঁষে তুষারে ঢাকা একটি পাহাড়। এটা হিমালয়ের অন্যান্য বিখ্যাত শৃঙ্গের তুলনায় খুব বেশী উঁচু নয়। আমাদের দেশেরও কয়েকজন অভিযাত্রী এর শিখরে বহু আগেই উঠেছে। কিন্তু এই আমেরিকান দলটি উঠতে পারেনি। পারেনি ছুটো কারণে। প্রথম কারণ, এই বছর হিমালয়ের সব অঞ্চলেই বরফ পড়েছে রেকর্ড প্রমাণ। এত বরফ অনেকের মতে গত সত্তর আশি বছরেও পড়েনি। এর জের এই মাসেরও মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। আর ওরা এসেছিল গত মাসের শেষে। এমনিতেই একটু আগে। দ্বিতীয় কারণ এই অভিযাত্রী দলের কোন সদস্যেরই তুষার শৃঙ্গে চড়ার ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। নিজেদের দেশে মাউণ্টেনিয়ারিং কোর্স শেষ করে ওরা প্রথম অভিযানের জন্য এই নন্দাখাতকে বেছে নিয়েছিল। যাই হোক, ন'জনের এই দলে ছিল পাঁচটি ছেলে ও চারটি মেয়ে। নন্দাখাতের শিখরে উঠতে গিয়ে প্রায় শুরুতেই এদের ছুটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে বরফের ধসের তলায় পড়ে মারা যায়।

—অ্যাভালান্সের তলায়? ডেভিড একাগ্র মনে সব শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল।

—না। অ্যাভালান্সে নয়। ঘটনাটা নন্দাখাতের যেখানে ঘটেছে সেখানে অ্যাভালান্সের কোন ভয় নেই। বরফের একটা বিরাট প্রাচীর ধ্বসে পড়েছিল ওদের ওপর যাকে বলে 'সেরাক ওয়াল'। অ্যাভালান্স হল পাহাড়ের ওপর থেকে যে বরফের বিশাল বিশাল চাঁই বা হিমবাহ পড়ে তাকে। এখানে সে-রকম কিছু ঘটার কথা নয়। কারণ জায়গাটা অ্যাভালান্স জোনের বাইরে।

—কত উঁচু ? আই মীন, অলটিচুড কত ?

—আমি সে কথাটাই তোমাদের ভাল করে বোঝাতে চাই। ডেভিডের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল প্রেমনাথ—ব্যাপার হল, গুছিয়ে বলতে শুরু করল সে, কোন পর্বত শৃঙ্গে উঠতে হলে অভিযাত্রীদের সেই পাহাড়ে চড়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁবু খাটাতে হয়, যাকে বলে ক্যাম্প। এর মধ্যে প্রথমটা হোল বেস ক্যাম্প। যেখানে দলের অভিযানের সব রসদ ও পাহাড়ে চড়ার নানারকমের সাজ-সরঞ্জাম মজুত থাকে। এই বেস ক্যাম্প অবধি মোটামুটি সবাই যেতে পারে। অর্থাৎ কুলি, ডাক্তার কিংবা দলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় লোক। তারপর আরো ওপরে উঠতে উঠতে হয় ক্যাম্প ওয়ান, ক্যাম্প টু। এই রকম একেবারে চূড়োয় পৌঁছনোর জন্য যতগুলো ক্যাম্পের প্রয়োজন হয় ততগুলো। সংখ্যাটা নির্ভর করে পাহাড়ের উচ্চতার ওপর। আমি যতদূর জানি, নন্দাখাতের মাথায় উঠতে প্রয়োজন হয় বেস ক্যাম্প ছাড়া আরও চারটে ক্যাম্পের। বেস ক্যাম্পের পর একমাত্র অভিযাত্রীরাই বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ওপরে ওঠে। এই আমেরিকান দলের ঐ পাঁচজন তখন ক্যাম্প ওয়ান থেকে ক্যাম্প টু-র জন্য রওনা হয়েছে। হঠাৎ পথে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। প্রথমে এল মেঘ তারপর জোর হাওয়া সব শেষে ব্লিজার্ড অর্থাৎ তুষার ঝড়। এই ব্লিজার্ডের জন্য মাঝপথে সবকিছু ওদের চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যায়। তার সঙ্গে শুরু হল বরফ পড়া। অর্থাৎ তুষারপাত। ওরা এগোতে না পেরে সেই সেরাক ওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ একসময় দেওয়ালটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে ওদের ওপর।

—তারপর ? ডেভিডের উদগ্রীব প্রশ্ন।

—তারপর যা হয় তাই। সেই বরফের নিচে মরে পড়ে রইল ওরা। প্রেমনাথ শুরু করল আবার, রাতে নির্দিষ্ট সময়ে ওদের কাছ থেকে ওয়ারলেসে কোন খবর না পেয়ে বেস ক্যাম্প আর ক্যাম্প ওয়ানের সহযাত্রীরা বুঝতে পারল ওপরে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। সেদিন সকাল থেকে নিচেও আবহাওয়া খুব খারাপ। পরের দিন ওরা কয়েকজন ওপরে ওঠে। উঠে দেখে বরফের দেওয়াল ধ্বসে পথ সামনে বন্ধ। একটা রুকস্যাকের বেল্টের সূত্রে ওরা আঁচ করতে পারল কোথায় জীবন্ত সমাধি হয়েছে পাঁচজনের। সঙ্গে সঙ্গে লাশ

উদ্ধারের কাজ শুরু হল। কিন্তু তিনদিনের বহু চেষ্টায় অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও মাত্র দুটি ছেলের লাশ পাওয়া গেল। আবহাওয়া আবার খারাপ হল। আবার বরফ পড়তে শুরু করল সেই অঞ্চলে। তখন বাধ্য হয়ে নন্দাখাত ছেড়ে বাকী চারজন ফিরে আসে। ওরা এখন দেশেও ফিরে গেছে। এই ঘটনা আজ থেকে পনেরদিন আগেকার। আজ মে মাসের আঠাশ তারিখ। বরফ পড়া এখন ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে। বরফ গলতেও শুরু করেছে কিছু কিছু। আর কদিন পরেই আমেরিকা থেকে অন্য দল আসছে নন্দাখাতের এই ঘটনাস্থলে গিয়ে বাকী লাশ তিনটেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তার আগেই একটা কাজ আমাদের সেরে ফেলতে হবে।

শুধু ডেভিডের নয়। রাজ ও গুল্সনেরও নিশ্বাস দ্রুত হল। ওরা তিনজনেই নিথর-নিস্পন্দ হয়ে এতক্ষণ তাকিয়েছিল প্রেমনাথের দিকে। এ কাহিনী ওদের কাছে একেবারে নতুন। রোমাঞ্চকর তো বটেই। প্রেমনাথের শেষ কথাটা ওদের আরও উদগ্রীব করে তুললো।

প্রেমনাথ ঝুঁকে ডানদিকের দেরাজ খুলে একটা মাঝারি খাম তুলে নিল। তার ভেতর থেকে হাফ সাইজের একটা রঙীন ছবি বের করে ডেভিডের দিকে এগিয়ে দিল সে।

ডেভিড দেখল। একটি বিদেশী মেয়ে। বাইশ তেইশ বছর বয়স। স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে সুন্দর। মাথায় সোনালী চুল কাঁধ অবধি ছড়িয়ে হাসছে।

—যে দুটি মেয়ে নন্দাখাতে মারা গেছে এ হল তাদের একজন। প্রেমনাথ ডেভিডের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আসল কথাটা পাড়ল এবার— তোমাদের কাজ হল নন্দাখাতের এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত জায়গায় গিয়ে বরফের তলা থেকে এই মেয়েটির লাশ খুঁজে বের করা। মোদ্দা কথা, আমেরিকা থেকে নতুন উদ্ধারকারী দল আসার আগে এই লাশ আমাদের চাই। তবে লাশটাকে খুঁজে কোথাও সরাতে হবে না। হাপিশও করতে হবে না। শুধু ওর গলা থেকে খুলে আনতে হবে লকেট সুদ্ধ হারটা। আর তার বদলে ঠিক ওরকম আরেকটা হার পরিয়ে দেবে সেই গলায়। ব্যস, তারপরেই তোমাদের ওখানকার কাজ শেষ। লাশটাকে আবার বরফের নীচে গুঁজে দিয়ে চলে আসবে। এই কাজের জন্য তোমাদের দু রকম পারিশ্রমিক ঠিক করা আছে। এক, যদি ব্যর্থ হও অর্থাৎ ওখানে গিয়ে অনেক খুঁজেও লাশ না পাও কিংবা

লাশ পেয়েও হারটা যদি না পাও তাহলে, রাজ আর গুলসনের দিকে হাতের ইশারা করে সে বললো, ওরা প্রত্যেকে দশ হাজার আর তুমি পাবে বিশ হাজার। কিন্তু যদি ওটা হাসিল করতে পার তাহলে তুমি পাবে পঞ্চাশ হাজার আর ওরা পাবে পঁচিশ হাজার করে।

ডেভিডের চোখে রক্ত যেন ছলকে উঠল। রাজ আর গুলসনের মগজের ঘিলুগুলো তখন ছত্রাকার। একটা কাজে এত টাকার কথা ওরা কখন ভাবতেও পারেনি।

ডেভিড ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাল আবার। মেয়েটির গলায় চকচকে সাদা হারের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, এটাই কি সেই হার।

—হ্যাঁ। প্রেমনাথ জবাব দিল ; শুধু লকেটটা ওখানে নেই।

—হারটা কি এত মূল্যবান !

—নিশ্চয়ই। যার হয়ে কাজটা আমরা করছি তার কাছে এর মূল্য অনেক। অবশ্য কি কারণে তা আমি জানি না। প্রেমনাথ ডেভিডের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে রাজের হাতে দিতে দিতে বললো, তবে আর সবার কাছে এর কোন মূল্য নেই কারণ হারটা নিছক রূপোর।

ডেভিডের মুখে আরেকটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দমন করল। এই দলে বেশী উৎসুক হওয়ার নিয়ম নেই। এখানে কাজটা কি ও তার পারিশ্রমিক কত এটুকু জানাই যথেষ্ট। কার জন্য সেই কাজ বা কেনই বা এটা করা হচ্ছে এ প্রশ্ন অবান্তর। অতএব হারের অনুসন্ধান-কারীকে হেঁয়ালীতে রেখেই সে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। তারপর তলিয়ে সব ভাবল কিছুক্ষণ। প্রেমনাথ ওর ভাবনার কোন বিঘ্ন ঘটাল না। রাজ ও গুলসনও তখন মূর্তিবৎ নিশ্চল।

—পুরো ব্যাপারটাই মোটামুটি একটা এক্সপিডিশন হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ডেভিড ওর দেহ শিথিল করে বললো, বরফের পাহাড়ে ওঠা তারপর সেখানে বরফ খুঁড়ে লাশ উদ্ধার করা এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। এই কাজে নামার আগে আরও ভাল করে একবার ভেবে দেখলে হত না ?

—খুব ভাল কথা। তুমি যে এই কাজের জটিলতা ও অসুবিধে গুলো

সম্বন্ধে সচেতন, জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। ছবিটা গুলসনের হাত থেকে ফেরৎ নিয়ে সে বললো, কিন্তু ডেভিড, আমিও এ ব্যাপারে কম সজাগ নই। আচ্ছা ধর, তোমাদের সঙ্গে যদি একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ নেপালী মাউন্টেনিয়ার দিই, তাহলে কেমন হয়? তারপরও কি ভাবার প্রয়োজন আছে?

—নেপালী মাউন্টেনিয়ার! কথাটা পুনরুচ্চারণ করে থেমে গেল ডেভিড। এতটা সে আশা করেনি।

—হ্যাঁ অর্থাৎ একজন শেরপা। প্রেমনাথ মাথা ঝাঁকাল। সিগারেটে জোর টান দিয়ে বললো, আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে একমত হবে যে নন্দাখাত পাহাড়ের ভিত পর্যন্ত যেতে তোমাদের কোন অসুবিধে নেই। কারণ আজকাল পিণ্ডারী জিরো পয়েন্ট অবধি মেয়ে বাচ্চারাও যায়। আর জিরো পয়েন্টের সঙ্গে নন্দাখাত বেস ক্যাম্পের খুব বেশী ফারাক নেই। তারপর সমস্যা শুধু নন্দাখাতে ওঠা নিয়ে। যদিও সেটাও খুব বেশী উঁচুতে নয়। তবু বরফের পাহাড়ে ওঠার জন্য অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি তোমাদের জেনে শুনে কোন ঝুঁকির ভেতর পাঠাতে পারি না। তার চেয়েও বড় কথা কাজটা আমাদের নির্বিঘ্নে হাঁসিল করা চাই। সেজন্যই এই শেষ পর্যায়ে দুর্গম পথটুকু তোমাদের যাতে কেউ নিরাপদে গাইড করে নিয়ে যেতে পারে আমি এ রকম একজন দক্ষ পার্ব্বতারোহীকে নেপাল থেকে আনাচ্ছি। সে কাল দুপুরেই দিল্লী এসে পৌঁছবে। লোকটার পেশাই হল হিমালয়ের উঁচু উঁচু শৃঙ্গে মাল পৌঁছে দেওয়া। বলতে গেলে বরফ, তুষার ও পাহাড় হল ওর নিত্য সঙ্গী। অতএব তার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে দুজন অন্তত যে নন্দাখাতের দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছুতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে। কারণ তোমাদের আমি এতটা অযোগ্য মনে করি না। বল ঠিক কি না?

ডেভিডের চোখমুখ সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠল। তবে মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল সে। থমথমে স্বরে বললো, আমি কাজের খাতিরে অভিজ্ঞতার কথা তুলেছিলাম। শেরপা থাকলে দুজন কেন আমরা তিনজনই ওপরে উঠতে পারি।

—না তার প্রয়োজন হবে না। প্রেমনাথ ভেতর ভেতর অনেক হালকা হয়ে বললো, একজনকে রসদ ও কিছু সাজসরঞ্জাম নিয়ে নিচে থাকতে হবে। ওপরে তুমি, শেরপা আর এদের মধ্যে একজন যাবে।

—কাজটা কদিনের ? ডেভিডের সোজাসুজি প্রশ্ন।

—কাল তোমরা রওনা হচ্ছ। পাশের দেওয়ালে ঝোলান ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল প্রেমনাথ। পরশু পৌঁছচ্ছ ভারারি। সেখান থেকে তোমাদের হাঁটা শুরু হবে। ষাট কিলোমিটার হাঁটতে হবে তিনদিনে। তার মানে তেসরা জুন তোমরা পৌঁছচ্ছ নন্দাখাত বেস ক্যাম্পে। সেখান থেকে এই শেরপাটির সাহায্যে একদিন কি দুদিনে উঠতে হবে সেই দুর্ঘটনা স্থলে। ওটা দু-একদিনে করা ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ পাঁচই জুন সন্ধ্যার মধ্যে তোমরা লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছ। তারপর লাশটা খোঁজার জন্য তোমরা মোট পাঁচদিন সময় পাবে। তার এক ঘণ্টাও বেশী নয়। কারণ আমাদের কাছে খবর আছে আটই জুন এই আমেরিকান রেসকিউ টিম দিল্লী এসে পৌঁছবে। অতএব বুঝতে পারছ—সময় আমাদের পুরোপুরি বাঁধা। এগারই জুন নন্দাখাত থেকে তোমাদের নেমে আসতেই হবে। যদিও লাশটা খোঁজার জন্য আরও দু-একদিন সময় পেলে ভাল হত। কারণ এই অঞ্চলটা এখনও সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। লাশ তিনটে ওরাও খুঁজে গেছে হন্যে হয়ে। পায়নি। কোথায় যে এগুলো তলিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। অথচ এই লাশটা আমাদের চাই-ই।

—ঠিক আছে। আমিও ওটা খুঁজে বার করবই। ডেভিডের বেপরোয়া সত্তাটা এতক্ষণে সাড়া দিল। জোর গলায় সে বললো, এই বরফের সঙ্গে আমরা যুঝতে পারি কিনা দেখা যাক। কিন্তু একটা কথা, বরফ খোঁড়ার ভাল যন্ত্রপাতি আমাদের সঙ্গে থাকবে নিশ্চয়ই ?

—শুধু ভাল নয়, একেবারে আধুনিক। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

—তাহলে এই যন্ত্রপাতি, খাবারের রসদ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য কুলিরও প্রয়োজন আছে।

—হ্যাঁ। তবে ওখানে একটু অসুবিধেও আছে। প্রেমনাথ নড়ে চড়ে বসল চেয়ারে। তোমাদের প্রত্যেকের মাল কিছুটা বেশি করেই বইতে হবে। কারণ পুরো ব্যাপারটা গোপনে রাখার জন্য একজনের বেশী কুলি সঙ্গে নেওয়া যাবে না। তাকেও আবার ছেড়ে দিতে হবে, জিরো পয়েণ্টে গিয়ে। যাতে সে তোমাদের গন্তব্য স্থল সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারে।

—বেশ। তাহলে কাল কখন কিসে যেতে হবে ?

ওদের অজান্তেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো প্রেমনাথ। মুখ তুলে বললো, সেটা কালকেই তোমাদের জানানো হবে। কোন্ ট্রেন, কোথায় বাস বদল করতে হবে, সব আমি বলে দেব। তার আগে আরো কয়েকটা কথা জেনে রাখো—যেখান থেকে তোমাদের হাঁটা শুরু হচ্ছে সেই ভারারিতে পৌঁছেই তোমরা এমন একজন কুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবে যে এই পথে শুধু ট্রেকিং নয় নন্দাখাত বেস ক্যাম্প অবধি গেছে। ওকে বলতে হবে তোমরা কোন কারণে জিরো পয়েণ্টে চার পাঁচদিন থাকছ। সে অনুযায়ী ওকে শুধু জিরো পয়েণ্ট পর্যন্ত ভাড়া করবে। তবে ওখানে গিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়ার আগে ওর কাছ থেকে নন্দাখাত বেস ক্যাম্পটা কোথায় হয় জেনে নেবে। শুধু খেয়াল রেখ ও যেন বুঝতে না পারে নন্দাখাতই তোমাদের গন্তব্যস্থল।

—তা নয় হল। কিন্তু, ডেভিড চিন্তা প্রকাশ করল। দুর্ঘটনার জায়গাটা আমরা চিনব কি করে?

—খুব সহজেই। প্রেমনাথ ওকে আশ্বস্ত করল, ঐ অভিযাত্রী দলের অবশিষ্ট চারজন ওখানে একটা উঁচু ঝাণ্ডা গেড়ে এসেছে। যাতে ওদেরও পরে জায়গাটা চিনতে অসুবিধে না হয়। তোমরা বেস ক্যাম্পের হদিশ পেলে এই শেরপাই তখন তোমাদের সে জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে।

—এই শেরপা কি জানে, কি উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি সেখানে?

—না। ওকে আমরা অন্য কথা বলে দিল্লীতে আনাচ্ছি। এলে পর ওকে শুধু বলা হবে, আমরা এই মেয়েটির বাবার নিযুক্ত লোক। আমাদের ওপর দায়িত্ব তার মেয়ের লাশ উদ্ধার করা। হারের ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র কিছু জানবে না। জানবে শেষ মুহূর্তে যখন লাশ পাওয়ার পর তুমি ওর সামনে হারটা পাল্টে সেই লাশ আবার ওকেই বরফে গুঁজে দিতে বলবে।

—তখন?

—তখন করার কিছু নেই। প্রেমনাথ কাঁধ ঝাঁকাল। জানাতে ওকে হবেই যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই তোমরা নন্দাখাতে এসেছ। মোটমাট লাশটা আবার ওকে দিয়ে ওখানে লুকিয়ে সেখান থেকে নেমে আসবে তোমরা। অসুবিধের কিছু নেই, সে মুহূর্তে সে চুপ থাকবে। কারণ এই লাশ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ওকে যে অ্যাডভান্স টাকাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা নেহাত কম নয়।

বকেয়া যেটুকু তারও পরিমাণ বিরাট। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য টাকাটা ও শেষ পর্যন্ত পাবে না।

—কেন? ডেভিডের কপালে ভাঁজ পড়ল।

—কারণ, প্রেমনাথ বাঁকাভাবে মৃদু হাসল। তারপর দুর্ঘটনা স্থল থেকে বেস ক্যাম্পের মাঝামাঝি কোথাও তোমাদের হাতে সে খুন হবে।

একটা হিস্ হিস্ নিশ্বাস ছাড়ল ডেভিড।—এরপর আবার খুন!

—আলবাৎ। প্রেমনাথের ইস্পাত কঠিন স্বর ঘরে কাটা কাটা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো,—পুরো ব্যাপারটা আমরা ক'জন ছাড়া আর কারও যাতে জানা না থাকে সেজন্যই ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে আমার মনে হয় নন্দাখাতের মত নির্জন বরফের পাহাড়ে একজনকে খুন করে তার লাশ হাপিশ করা তোমাদের মত ছেলেদের পক্ষে কোন ব্যাপারই নয়।

কথাটা সত্যি। ডেভিড মনে মনে ভাবল। ঐ দুর্গম পাহাড়ে বরফের কবর খুঁড়ে লাশ উদ্ধার করার চেয়ে এই খুন করাটাই বরং বেশী সহজ। পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে সে বলল, বেশ তাও হল। কিন্তু এই শেরপার খোঁজ পড়বে না তার দেশে?

—ওটা আমাকে ভাবতে দাও। প্রেমনাথের গলায় কিঞ্চিৎ বিরক্তির আওয়াজ। তারপরই সে বলল, একটা কথা জেনে রাখ, এই শেরপাটির দেশে কেউ জানবে না সে কোথায় আসছে ও কেন আসছে। তাছাড়া সে নিজেও কিছু জানে না। ওর গন্তব্যস্থল ও জানবে শেষ মুহূর্তে। একেবারে সেখানে পৌঁছে। তার আগে নয়।

প্রেমনাথ এবার উঠে দাঁড়াল। অর্থাৎ দীর্ঘ কথাবার্তার এখানেই সমাপ্তি।

ডেভিড গা ঝেড়ে বলল, তাহলে আমাদের আর কিছু জানার নেই?

—আপাততঃ কিছু নেই। প্রেমনাথ ঝুঁকে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে পেছন দিকে গিয়ে ঘরের অন্য দুটো বাতির সুইচ্ নিভিয়ে দিল। তারপর ফিরে এসে বলল, এখন যা আছে শুধু দেখার। তোমরা চেয়ার তিনটে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নাও।

প্রেমনাথ স্লাইড প্রোজেক্টরের দিকে হাত বাড়াল এবার। ওরা তিনজন নির্দ্দেশমত চেয়ার তিনটে ঘুরিয়ে সামনে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসল।

খানিকক্ষণ পর টেবিল ল্যাম্পটাও নিভে গেল। তারপর অন্ধকার ঘরে

সামনের দেয়ালে ভেসে উঠল একের পর এক ছবি। সে ছবি পিণ্ডারী ট্রেকিং থেকে শুরু করে নন্দাখাত বেস ক্যাম্প, ক্যাম্প ওয়ান ও সেই সেরাক ওয়াল পর্য্যন্ত। তবে এগুলো যখনকার তোলা তখন ঐ অঞ্চলে বরফ সেরকম ছিল না। ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে সে কথা বার বার বলছিল প্রেমনাথ। এই এলাকা-গুলোই ওরা এখন বরফে ঢাকা পাবে। ডেভিড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। দু' একটা ছবি আবার ও দেখতে চাইল। মোটামুটি এভাবে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে এদের ভালভাবে পরিচিত করিয়ে প্রেমনাথ স্লাইড প্রোজেক্টর ছেড়ে ফিল্ম প্রোজেক্টর ধরল। তারপর ওদের দুটো এইট মিলিমিটার ফিল্ম দেখান হল। একটা, পাহাড়ে কি ভাবে চড়তে হয় সে সম্বন্ধে। আর একটা, তুষারে চলার খুঁটিনাটি নিয়ে। অবশ্য দুটোই ছিল সহজগম্য কোন পর্বতশৃঙ্গের জন্য। যেখানে চড়তে খুব বেশী কায়দা কানুন ও বিশেষ কোন সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। যেমন ফিক্সড রোপ, রক পিটন ইত্যাদি। স্লাইড ও ফিল্ম দুটো দেখে ওরা যেমন পাহাড় ও তুষার সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল হল তেমনি হল নিশ্চিন্ত। যাক্ ব্যাপারটা যতটা মারাত্মক ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়।

সব দেখিয়ে শুনিয়ে ওদের রাত দশটা কুড়িতে ছাড়ল প্রেমনাথ। তবে ছাড়ার আগে বারবার সে বলে দিল পরের দিন দুপুর বারোটার মধ্যে ফের এখানে আসতে। ওদের ট্রেন কাল রাতে। কিন্তু তার আগে আরও অনেক কাজ বাকী আছে। আরও কিছু বোঝানোরও আছে।

সম্মতি জানিয়ে তিনজন একে একে বিদায় নিল। ওরা চলে গেলে আরেকটা নতুন সিগারেট ধরাল প্রেমনাথ। আয়েস করে তারপর বসল চেয়ারে। যাক্ প্রথম দানটা ভালই চালা গেছে। এখন অনেক নিশ্চিন্ত সে অনেক আশ্বস্ত। ডেভিড রাজী না হলে গোড়াতেই মুশকিল হত। এ ধরনের কাজে ওর মত বেপরোয়া বুদ্ধিমান ছেলে ছাড়া আর কারো কথা ভাবাই যায় না। তারপর ছেলেটার আবার বরফ ও পাহাড় সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আছে। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে সব সোনায় সোহাগা। আর সেজন্যই অনেক সামলে অনেক কায়দা করে কথা বলতে হয়েছে ওর সঙ্গে।

ডেভিডকে পাওয়া গেলে রাজু আর গুলসনও আসবে। ও নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায়নি প্রেমনাথ। কারণ ওর ভাল করেই জানা ছোঁড়া দুটো

ডেভিডের একেবারে লেজুড়। ডেভিড যেদিকে যাবে ওরাও সেদিকে গুতোবে। তা ছাড়া ভাল মাল-কড়ি পেলে কাজের ধরন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার পাত্র ওরা নয়। এই কাজের প্রাপ্য শুনে নিশ্চয়ই ভিরমি খেয়ে গেছে দুজন। সিগারেটে দীর্ঘ টান দিল প্রেমনাথ। মুচকি হাসল। যাক গে, মগজে ছিটেফোঁটা ঘিলু না থাকলেও ছোঁড়া দুটো বিশ্বাসী। শুধু ডেভিড থাকলেই কি কাম ফতে হবে? বরফ খোঁড়ার মালপত্র অত উঁচুতে নিয়ে যাবার জন্যও দুজন নিজেদের লোক দরকার। সেদিক থেকে হিসেব এখন পর্যন্ত ঠিক। এবার শুধু কাজটা হাসিল হলেই হয়।

কিন্তু···হবে তো? পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল প্রেমনাথ। এটা একটা ভাবনার বিষয়। ভাবনাটা পাহাড় নিয়েই। প্রেমনাথের বুকের কোণ আশঙ্কায় শিরশির করে উঠল। এই কাজে একমাত্র বাধা হিমালয়। হিমালয় যে এত ভয়ঙ্কর এত বিপদসঙ্কুল ওর ধারণা ছিল না। মিঃ পামেরোর কাছ থেকে কাজের প্রস্তাবটা আসতেই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে হয়েছে ওকে। হিমালয়ে নাকি সব কিছু অনিশ্চিত। পদে পদে বিপদ সেখানে। রাক্ষুসে ঠাণ্ডা আবহাওয়া. গভীর খাদ, বরফের ফাটল, তুষারপাত, অ্যাভালান্স এ ধরনের হাজারো ঝুঁকিতে ভরপুর। কখন ওখানে বরফের বিশাল চাঁই ধসে সব ধ্বংস করে দেয়, কখন তুষার ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায় তাঁবুর পর তাঁবু, পা পিছলে কার জীবন্ত সমাধি হবে, কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। কথাগুলো মনে পড়তেই অস্বস্তি বোধ করল প্রেমনাথ। যেখানে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সহ শিক্ষিত বিদেশী অভিযাত্রীদের এই কাহিল অবস্থা সেখানে ডেভিডরা যে শেষ পর্যন্ত কতটা কি করতে পারবে, কে জানে? অথচ কাজটা পুরোপুরি হাসিল করার জন্য এর মধ্যে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েছে প্রেমনাথ। নেপালের দক্ষ শেরপা আনানো থেকে শুরু করে ভাঁজ করা হাল্কা বরফ খোঁড়ার বেলচা পর্যন্ত যোগাড় করেছে। যোগাড় করেছে পাহাড়ের চড়া নানারকমের আনকোরা সাজসরঞ্জাম। তার মধ্যে আছে হাই অলটিচুড স্লিপিং ব্যাগ, হাই অলটিচুড তাঁবু, হেড ল্যাম্প সহ হেলমেট, এলুমিনিয়ামের সিঁড়ি, ফিক্সড রোপ, ক্যারাবাইনার, বিলে, পিচ্ছিল বরফে আটকে থাকার শক্ত নোঙর, সব। এমন কি জাপানী ছোট-ছোট ওয়াকি-টকি পর্যন্ত। অবশ্য এ সব যোগাড় করে দিয়েছে মিঃ পামেরো স্বয়ং। মোদ্দা কথা, কোনো পাহাড়ী অভিযানের চেয়ে

কোনো ব্যাপারে ওদের কমতি নেই। নিখুঁত পরিকল্পনা। কঠিন কাজের মতই কঠিন প্রস্তুতি। এতটুকু গাফিলতি নেই কোথাও। এখন শুধু হিমালয় সদয় হলেই হয়।

প্রেমনাথ ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত এগারোটা বেজে পঞ্চাশ। আর কিছুক্ষণ পর মিঃ পামেরোকে ওর ফোন করার কথা। কাল বারোটার আগে ওর কাছে থেকে মেয়েটির আরেকটি ছবি ও হারের নকলটা নিয়ে আসতে হবে। ব্যস তারপর ডেভিডের দল আর শেরপাটিকে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে ওর আপাতত ছুটি। তারপর শুধু অপেক্ষা। কয়েকটা দিন। ডেভিড হারটা নিয়ে এলে আবার সে ছুটবে পামেরোর কাছে।

পা-মে-রো! নামটা মনে মনে আয়েসের সঙ্গে উচ্চারণ করল প্রেমনাথ। প্রায় দেবদূতের মত তার আগমন হয়েছে ওদের কাছে। ভাবতেও আনন্দে মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। আমেরিকার কুখ্যাত দল মাফিয়া যাদের রোমহর্ষক কাজ-কারবারের বিবরণ সারা দুনিয়াতে কিংবদন্তির মত ছড়ানো তাদেরই একজন সাক্ষাৎ কর্তা-ব্যক্তি হল এই পামেরো সাহেব। তিনি খোদ এসেছেন প্রেমনাথদের সাহায্য নিতে। নন্দাখাত পাহাড়ের বরফের তলায় পড়ে থাকা মেয়েটির গলার হার তার চাই। যদি সেটা প্রেমনাথরা সঠিক জায়গা খুঁজে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে তাহলে এর পেছনে খরচ-খরচা বাদে পুরো দশ লক্ষ টাকা দেবেন ওদের। এত টাকা খরচ করে ওই সামান্য হার হাতানোর পেছনে কি রহস্য আছে সে কথা এখন আর ভাবছে না প্রেমনাথ। প্রেমনাথ আপাতত ওই হারটার জন্য উদগ্রীব। হারটা এনে পামেরো সাহেবের সুনজরে পড়তেই হবে ওকে। তখন শুধু দশ লক্ষ নয় পামেরোর বহু মূল্যবান দোস্তিটাও ওরা হাসিল করবে। যার দাম ভবিষ্যতে এই দশ লক্ষের বহু বহু ওপরে চলে যেতে পারে। কারণ আমেরিকার একটি মাফিয়া দলের কর্তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার অর্থই হল আন্তর্জাতিক অপরাধ-জগতে ভাল স্থান করে নেওয়া। পামেরোর কথা ভাবতে ভাবতেই হাওয়ায় ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগলো প্রেমনাথ।

এশিয়াডের দৌলতে দিল্লীতে এখন ফাইভ স্টার হোটেলের ছড়াছড়ি। এরকমই এক নতুন ঝকঝকে তকতকে বিরাট হোটেলের সামনে দুপুর বারোটা দশ নাগাদ একটা রিনল্ট গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়িটার সামনে সোফার। চটপট

নেমে পেছনে দরজাটা খুলে দিল সে। প্রেমনাথ নীচে পা রাখার আগে একবার দেখে নিল চারপাশটা। তারপর গটগট করে সে এগিয়ে গেল লাউঞ্জের দিকে।

প্রেমনাথের পরণে এখন দামী স্যুট-টাই। চোখে ভারী চশমা। হাতে সৌখিন পোর্টফোলিও ব্যাগ। লিফটে করে প্রথমে সোজা পাঁচতলা। তারপর নির্দিষ্ট ঘর। টোকা শুনে বেরিয়ে এল হাউস-কোট পরা এক মাঝবয়সী সাহেব। সাদাটে ফরসা। ছিপছিপে গড়ন। তীক্ষ্ণ নাক। কটা চোখ। দেখতে অনেকটা প্রাক্তন ন্যাৎসী বাহিনীর কুখ্যাত জল্লাদ আইখ ম্যানের মত।

—সুপ্রভাত, মিঃ পামেরো। মাথা ঈষৎ নামিয়ে প্রেমনাথ মৃদু হাসল।

—সুপ্রভাত। পামেরো গম্ভীর স্বরে বলল, এস। তারপর প্রেমনাথ ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে সে আবার বলল, এত দেরী কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খুব দুঃখিত। প্রেমনাথের মোসায়েবী স্বর। আপনাকে জানাতে পারলাম না। এয়ারপোর্ট থেকে শেরপা ছেলেটিকে তুলতে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গেল।

—কোথায় রেখেছে ওকে?

—আজ্ঞে শহরতলীর একটা সাধারণ সরাইখানায়। কথা বলতে বলতে ওরা সুসজ্জিত বসবার ঘরের দুটো কোচে সামনা-সামনি বসল।

প্রেমনাথ হাতের ব্যাগটা সামনের টেবিলে রেখে বলল, আমি ঠিক সময়েই চলে আসতাম। কিন্তু ওকে হোটেলে ছেড়ে আমার ছদ্মবেশ যেখানে পালটাতে গিয়েছিলাম সেখানে দেখি দলের কয়েকজন লোক বসে। ওদের সামনে আমি ওই বেশে যেতে চাইছিলাম না। তাই আবার অন্য জায়গায় ছুটতে হল।

—শেরপাটি তোমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করেছে?

—না। মুচকি হাসল প্রেমনাথ। নেপালীরা এমনিতেই কম কথা বলে। তাছাড়া ওকে আমি কাঠমাণ্ডুতে বলে দিয়েছিলাম কোনো প্রশ্ন সে করতে পারবে না। কাজ করবে টাকা নেবে—ব্যস। এখানে এসে তাই আমাকে ও কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

—তাহলেও খেয়াল রেখ। পামেরো তার চোখের মণি দুটো গাঢ় করে বলল, এই ছেলেটিকেই খুব সাবধানে চালাতে হবে। আর যাই হোক ও তোমার দলের কেউ নয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জন্য আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। প্রেমনাথ মাথা হেলিয়ে

বলল, আমার ছেলেদের সে ভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে। ওরা এর সঙ্গে কায়দা করেই কথা বলবে। বিশেষ করে ওর গন্তব্য স্থল ছেলেটি শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত কিছুতেই জানতে পারবে না।

—বেশ আমি তোমাকে এখন আর আটকে রাখতে চাই না। পামেরো কোচ থেকে উঠতে উঠতে বলল, আজ কটায় ট্রেন ওদের ?

—রাত আটটা চল্লিশে। প্রেমনাথ মুখ তুলে বলল, আমি শেরপা ছেলেটির কাছে এর পর রাত আটটার সময় যাব।

পামেরো চলে গেল ভেতরের দিকে।

মিনিট দশেক পর ফিরে এল আবার। ওর হাতে এখন কালো মাঝারী আকারের একটা খাম ও ছোট্টো গোল মেটালিক একটা বাক্স। বাক্সটা দেখতে বেশ আকর্ষণীয়।

কোচে বসে বাক্সটাই প্রথমে ওর দিকে এগিয়ে দিল পামেরো—এ নাও এই হল আসল জিনিষ। দেখে রাখ ভাল করে।

প্রেমনাথ খুলল বাক্সটা। ভেতরে ঝকঝকে একটা রূপোর হার। তুলে দেখলো সে হারটা। খুব একটা চওড়া নয়, তবে কাজ আছে অপূর্ব। নীচে খ্রীষ্টধর্মের ক্রসের মত লকেটটা হারের তুলনায় মনে হল বিরাট। বড় ট্যাবলেটের মত লকেটের ওপর বসানো আছে একটা পাথর। তবে দামী নয়। প্রেমনাথ মনে মনে অবাক হল। যদিও এই হারের কিছু অংশ মেয়েটির ছবিতে দেখেছে সে, তাছাড়া মিঃ পামেরোও বলেছেন ওকে এমন কিছু আহামরি হার নয়, তাহলেও প্রেমনাথ ভেবেছিল হয়ত লকেটটা দুর্লভ কোনো বস্তুর তৈরী। এখন দেখছে তাও নয়। কারণ আসল হারের অবিকল এই হার। দামী পাথর কিংবা দামী কোনো ধাতুর হলে তার নকলও হবে সেরকম। কিন্তু তা আদৌ নয়। অর্থাৎ অতি সাধারণ ওই হার। তাহলে এই হারের জন্যই এত কিছু! এত অয়োজন, এত ধকল! সুদূর আমেরিকা থেকে এই ছুটে আসা! অকল্পনীয় বিরাট পারিশ্রমিক! কি রহস্য আছে তাহলে এর পেছনে? যাক ও নিয়ে ভেবে এখন লাভ নেই। প্রেমনাথ হারটা ঢুকিয়ে বাক্স বন্ধ করে দিল।

পামেরো এতক্ষণ একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল প্রেমনাথকে। ওর চোখ-মুখ হাব-ভাব সব জরীপ করছিল যেন। প্রেমনাথ বাক্সটা বন্ধ করতেই সে শরীর শিথিল করে বলল, তাহলে এটা দেবে ওই ছেলেটিকে যার কথা

কাল রাতে তুমি ফোনে বলছিলে। তাকে বলবে এই হারটা ওর কাছে এমন ভাবে রাখতে যাতে খাওয়া দাওয়া ঘুম এমনকি স্নানের সময়ও যেন ওর সঙ্গ ছাড়া না হয়। মনে রেখ, নকল হলেও হাত-ছাড় কিংবা হারিয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে। আর এই হল মেয়েটির দ্বিতীয় ছবি।

পামেরো হাতের কালো খামখানা এবার এগিয়ে দিল ওর দিকে। প্রেমনাথ হারের বাক্সটা একপাশে সরিয়ে খামখানা নিল।

—তুমি যে ছবিটা কাল আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছ এটা তার চেয়ে একেবারে অন্য রকম। পামেরো কোচে গা এলিয়ে বলল, ওই ছবিতে আছে মেয়েটির শুধু মুখ। এতে আছে ওর সানাক্তিকরণের চিহ্ন। মেয়েটি একবার মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিল। তখন ওর পিঠে একটা অপারেশন করতে হয়। সেই অপারেশনের পরের ছবি এটা।

ছবিখানা খুলে দেখল প্রেমনাথ। এই ছবিতে মেয়েটির শুধু পিঠখানাই দেখা যাচ্ছে। একটা ধপধপে সাদা বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে আছে সে। তার উন্মুক্ত পিঠে একটা দাগ। তারই ছবি এটা। আশে পাশের দু-একটা সাজ-সরঞ্জাম দেখে বোঝা গেল ছবিটা হাসপাতালে তোলা।

পামেরো আবার বলল, পিঠের ওই দাগটাই হল মেয়েটির একমাত্র বড় আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। এই ছবিটা এজন্যই দিলাম। কারণ লাশটা পাহাড়ে কোথায় কি অবস্থায় পড়ে আছে কে জানে। এমনও হতে পারে মুখটা হয়ত জখমের জন্য চেনাই যাবে না। তখন এই দাগ ওকে চিনিয়ে দেবে। যাতে ভুল করে এমন যেন না হয় যে তোমাদের ছেলেরা আসল মেয়েটির পরিবর্তে অন্য মেয়েটির হার পালটে চলে আসে।

—তা কেমন করে হবে মিঃ পামেরো? প্রেমনাথ ছবিটা খামে ঢুকিয়ে বলল, এই হারের সঙ্গে অন্য মেয়েটির গলার হার মিলবে কি করে। হার পালটানোটাই যখন আসল ব্যাপার তখন আমার ছেলেরা নিশ্চয়ই দেখে নেবে হার দুটো একই রকম দেখতে কিনা।

—না, ব্যাপারটা ঠিক তা নাও হতে পারে। পামেরো পায়ের ওপর পা তুলে কর্তৃত্বের স্বরে বলল, তা হলে এই সনাক্তিকরণের ওপর আমি এত জোর দিতাম না।

প্রেমনাথ থতমত খেয়ে গেল। পামেরোর দিকে একটু অবাক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আধো আধো স্বরে বলল—আপনি কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ পামেরো।

পামেরো একই ভঙ্গীতে বলল—নন্দাখাত পাহাড়ে যে তুটি মেয়ে মারা গেছে তারা পরস্পারের প্রিয় বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব এত গাঢ় ছিল যে আমার কাছে রিপোর্ট আছে নিজেদের শহরে ওরা অনেক সময় এক পোশাক এক গয়না-গাটি পরে ঘুরে বেড়াত। সে জন্যই আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। এমন হতে পারে এখানেও হয়ত ওদের তুজনের গলায় একই রকমের হার আছে। অতএব কথাটা তোমাদের ছেলেদের মগজে ভাল করে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে শুধু আসল নকল হার তুটো মিললেই চলবে না তার সঙ্গে হয় ছবির মুখ না হয় পিঠের দাগও মিলিয়ে নিতে হবে। বুঝলে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝেছি। প্রেমনাথ সহজ হয়ে মাথা নাড়ল।

পামেরো এবার হাউস কোটের তু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল একশ টাকা নোটের পাঁচটে তোড়া। তোড়াগুলো পর পর টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, গত হপ্তায় পঞ্চাশ দিয়েছি। এই নাও আরো পঞ্চাশ। লাখ হলো পুরো। এর পরও যদি প্রয়োজন হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তবে জেনে রেখো ওই হার আমার চাই-ই চাই। যে ভাবে হোক।

প্রেমনাথ সঙ্গে-সঙ্গে বিনীত হয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ মিঃ পামেরো, আমাব চেষ্টায় বিন্দুমাত্র কসুর নেই। আমার বিশ্বাস যে ভাবে এগিয়েছি এই হার আমাদের হাতে আসবেই। তবে শুধু ভয় হিমালয়কে নিয়ে। এ এক এমন জায়গা, যেখানে কেউ নিশ্চিত হতে পারে না।

—কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাই!!! হঠাৎ সেণ্টার টেবিলের ওপর একটা সজোরে চাপড় মারল পামেরো। স্বরেও পরিবর্তন হল ওর। কর্কশ হিংস্র গলায় বলে উঠল। তোমাকে আমি আগেই বলেছি, নন্দাখাতে দরকার হলে হেলিকপ্টার পর্যন্ত নামাতে পার সব খরচ আমার। কিন্তু আমেরিকার উদ্ধারকারী দল আসার আগে ওই হার আমাকে এনে দিতে হবে। আবার আমি বলছি যে ভাবেই হোক।

প্রেমনাথ ঢোক গিলল কয়েকটা। পামেরো সাহেবের এই বিকট রূপ হজম করে তারপর আমতা আমতা করে বলল, হেলিকপ্টার নামানোর কথা আমিও ভেবেছিলাম মিঃ পামেরো। কিন্তু মুশকিল হল ভারতবর্ষে হিমালয়ের এই

এলাকা গুলো ভারতীয় সেনা দলের তত্ত্বাবধানে। এখানে হেলিকপ্টার নামাতে পারে একমাত্র তারাই। আমরা যে চুপি-চুপি যাব তারও উপায় নেই। তবে আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমি যে শেরপাটিকে কাঠমাণ্ডু থেকে আনিয়েছি এর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যেতে পারে। ছেলেটি তিনবার এভারেস্ট একসপিডিশনে গেছে। একবার এভারেস্টে চড়েছেও। এই সব ছোটখাটো বরফের পাহাড় ওর নখদর্পণে।

—ঠিক আছে। পামেঁরো কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তুমি এখন যেতে পার। আমি আপাতত এইটুকু জানলেই খুশী হব যে তুমি আমার মুল্যবান সময়গুলো সম্বন্ধে সচেতন। মনে রেখো, এই দীর্ঘ সময় আমি যদি এই অজ ভারতবর্ষে না কাটিয়ে স্টেটসে কাটাতাম তাহলে এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার হয়ে যেত। এই সময়টা যেন আমার ব্যর্থ না যায়।

—আমিও সর্বান্তকরণে তাই চাই মিঃ পামেরো। প্রেমনাথ বাক্স, খাম ও টাকা গুলোকে পোর্টফোলিও ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত এসে ঝুঁকে পামেরোকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

কলকাতা

ডাক্তার জয়ন্ত বোস যোধপুর পার্কের একজন বয়স্ক চিকিৎসক। তার বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। এককালে এখানকার এক নামকরা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। এখন চাকরী ছেড়ে যোধপুর পার্কে নিজের বাড়িতে ও লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটি ভাড়া করা চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন। বাড়িতে বিকেলে। লিণ্ডসে স্ট্রীটে সকালে।

সপ্তাহে রোববার সকালটাই তার একমাত্র ছুটি। তাই ঠিক এ মুহূর্তে তিনি নিজের ড্রয়িংরুমে বসে বেশ আরাম করে খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে খালি চায়ের কাপ আর ফাঁকা জলখাবারের প্লেট সামনে সেণ্টার টেবিলে আজকের আরো চারটে কাগজ, তুটো ইংরাজী, তুটো বাংলা। হাতেরটা নিয়ে মোট পাঁচটা কাগজ রোববার সকালে তাঁর চাই।

ডাক্তার বোসের স্বাস্থ্য মাঝারী। চোখে চশমা। মাথায় ঘন কালো চুল। খয়েরী রঙের হাউস-কোটের তলায় তাঁর ফরসা দেহটা ফুটে উঠছিল যেন।

আটটা পঞ্চাশে ঘরের ফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে। ডাক্তার বোস একটু বিরক্তির ভঙ্গীতে তাকালেন সেদিকে। ডাক্তার হওয়ার এই এক ঝামেলা। একটু হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে বসার কোনো উপায় নেই। নির্ঘাত কোনো পেশেণ্ট। হয়ত কোনো পরামর্শ চাইবে। চাকর ভেতর থেকে ছুটে এল। ফোনটা তুলে নিয়ে এল কাছে। সোফার ওপর রেখে কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল সে। ডাক্তার বোস রিসিভার তুললেন—হ্যালো ?

—কে ডাক্তার ?

—আপনি ?

—রাখো তোমার আপনি। আমি অবিনাশ বলছি। তুমি করছ কি এখন ?

শুনে যেমন নিশ্চিন্ত হলেন খুশীও হলেন ডাক্তার বোস। অবিনাশ ওর বন্ধুস্থানীয়। যে কোম্পানীর তিনি মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন তার অন্যতম ডিরেক্টর। উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, তাই বল। আমি তো তোমায় পেশেণ্ট ভেবে মনে মনে গালাগালি দিচ্ছিলাম। কি ব্যাপার বহুদিন পর গলা শুনছি। এতদিন কোথায় ছিলে ?

—হুঁ! তোমরা ডাক্তাররা ভাব যে শুধু তোমাদেরই সময় সব বাঁধা। আমাকেও একটা কোম্পানী সামলাতে হয় বুঝলে। লোডশেডিং, লে-অফ, স্ট্রাইক এই সবের ধকল সামলাতে সামলাতে বহুদিন পর আজকের সকালটা একটু ফাঁকা পেলাম।

—বেশ তো। চলে এস এখানে।

—সেজন্যই ফোন করছি। তুমি আবার রোববার সকালে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাও কিনা—

—আজ কোথাও যাচ্ছি না। ডাক্তার বোস উত্তর দিলেন। আমি এই মঙ্গলবার দিন-পনেরোর জন্য বাইরে যাচ্ছি। আজ সারাদিন তার কিছু প্রস্তুতি করব।

—বাইরে বলতে তো পাহাড়। সেই পিণ্ডারী ?

—হ্যাঁ।

—এই মঙ্গলবারেই যাচ্ছ। বেশ বেশ। ওপার থেকে অবিনাশ বাবুও

আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তোমার কাছে এখন আমার আসার ওটা একটা কারণ।

—তার মানে! ডাক্তার বাবু অবাক স্বরে বললেন, তুমি যাবে নাকি?

—চুপ কর। অবিনাশ বাবুর ধমকের সুর। তুমি পাগল বলে আমিও পাগল হব? তবে হ্যাঁ তোমার কাছে আরেকজন ক্ষুদে পাগলকে নিয়ে আসছি আমি। এই ছোঁড়ার এ রোগ যে ধরল কি করে আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক—এলে পরেই সব কথা হবে।

—কিন্তু নিয়ে আসছ কাকে?

—আমার ছোট পুত্র শ্রীমান সৌরভকে।·· দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ওপাশে ফোনটা রেখে দিলেন তিনি।

ডাক্তার বোস মৃদু হাসলেন। তারপর তিনিও রেখে দিলেন রিসিভার।

যোধপুর পার্কের এই বাড়িতে ডাক্তার বোস তাঁর চাকর ও একজন রান্নার ঠাকুর সহ একাই থাকেন। তাঁর স্ত্রী সাত বছর আগে দীর্ঘ রোগে ভুগে মারা গেছেন। একমাত্র ছেলে চাকরীর সুবাদে এখন সুদূর বাঙ্গালোর প্রবাসী। ভদ্রলোকের একটি মাত্র নেশা, সেটা হল দেশ ভ্রমণ। সদা ব্যস্ত ডাক্তার হওয়া সত্বেও তিনি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রায় সব বেড়ানোর জায়গা ইতিমধ্যে ঘুরে ফেলেছেন। এখন সমতল ছেড়ে ধরেছেন পাহাড়। পাহাড় বলতে ট্রেনে বা বাসে চড়ে শুধু শৈলাবাস নয়। তারও ওপরে যান তিনি। হেঁটে বা ট্রেকিং করে একেবারে পর্বত অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। তাঁর এমনই মনের জোর যে বয়েস এ ব্যাপারে এখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ ভাবে তিনি গত দশ বছরে ঘুরেছেন সাণ্ডাকফু-ফালুট-রূপকুণ্ড ও পিণ্ডারী। তাঁর এই বেড়ানোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি প্রতিটি পাহাড়ী এলাকায় টানা তিন বছর যান। বছরে একবার বেড়াতে গিয়ে সেখানে এই তিনটে বছর তিনি আশে-পাশের পাহাড়ী গ্রামের লোকদের মধ্যে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। সঙ্গে নিয়ে যান প্রচুর ওষুধ-পত্র ও একজন কম্পাউণ্ডার। এই ওষুধ-পত্র তিনি বিনামূল্যে গরীব পাহাড়িয়াদের মধ্যে বিতরণ করেন।

প্রথম বছর রূপকুণ্ড গিয়ে এর প্রয়োজন তিনি ভীষণ ভাবে অনুভব করেছিলেন। তখন তিনি দেখেছেন চিকিৎসা ও ওষুধ-পত্রের অভাবে দূরবর্তী এই পাহাড়ী মানুষরা কত অমানুষিক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে। রূপকুণ্ডের পথে

এরকম একটি নিউমোনিয়া পীড়িত শিশুকে তিনি প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে বাঁচাতে পারেন নি। ডাক্তার হয়েও এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হল বলে মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন তখন। তাই তার পরের বছর থেকেই শুরু করেছেন এই জনসেবা।

এখন তিনি মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, যতদিন ক্ষমতা থাকবে এই পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে গিয়ে প্রতি বছর কদিন অন্তত বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। এবং টানা-তিন বছরের জন্য এক-একটি এলাকা বেছে নেবেন তিনি। সেই অনুযায়ী গত দু বছর ধরে ভদ্রলোক পিণ্ডারী যাচ্ছেন। এই বছরও আবার যাচ্ছেন আগামী পরশু।

নটা কুড়িতে অবিনাশ মুখার্জীর সাদা ফিয়াট গাড়িখানা ডাক্তার বোসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার বোস বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। গাড়ি থেকে অবিনাশ বাবু নামলেন ও তার পাশের সীট থেকে নামল তার পুত্র সৌরভ। দুজনেরই পরণে সুবিন্যস্ত শার্ট প্যাণ্ট।

অবিনাশ মুখার্জী ডাক্তার বোসের প্রায় সমবয়সী ও তার মতই স্বাস্থ্যবান। তফাতের মধ্যে তিনি একটু লম্বা ও কালো। সৌরভের বয়েস সতেরো। ওর গড়ন ছিপছিপে। উন্নত নাক। চোখে মুখে শিশু সুলভ সরলতা।

—এসো এসো। দুজনকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন ডাক্তার বোস। ওদের সোফায় বসিয়ে নিজে সামনে বসে তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার বল, কি বলছিলে তখন পিণ্ডারী নিয়ে।

—বলব আর কি। অবিনাশ বাবু অনুযোগের স্বরে বললেন, তোমার মত আমার এই পুত্রও পর্বত-পরিব্রাজক হয়েছেন। তুমি পরশু পিণ্ডারী যাচ্ছ। এ যাচ্ছে কাল।

—তাই নাকি! ডাক্তার বোস চোখে-মুখে হাসি নিয়ে তাকালেন সৌরভের দিকে। কে কে যাচ্ছ তোমরা?

সৌরভ সোজা হয়ে বসল সোফায়। নম্র স্বরে বলল, আমরা চার বন্ধু যাচ্ছি, কাকাবাবু।

—এর আগে আর কোন ট্রেকিং করেছো কেউ?

সৌরভ উত্তর দেবার আগে অবিনাশ বাবু সেই একই স্বরে বলে উঠলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই তো ওর সর্বনাশ করেছে। গতবছর হায়ার সেকেণ্ডারী

পরীক্ষা দিয়ে দার্জ্জিলিঙে মামার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। সেটিও এক পাহাড়ের পোকা। সে এই একরত্তি ছেলেটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই তেরো হাজার না কত ফুট উঁচু সান্দাকফুতে। বোঝো! ব্যস ওতেই নাকি শ্রীমান ট্রেকিং-এর দারুণ মজা পেয়ে গেছে।

—পাবেই তো। ডাক্তার বোস নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

—আশ্চর্য! বলছ কি? মাথায় হাত পড়েছে আমার। অবিনাশ বাবু হা-হুতাশের মত বললেন, চারটে এরকম বয়েসী ছেলে একা-একা পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার যাবে? তা কখনো হয়? তিনমাস ধরে নাকি ওদের প্রস্তুতি চলছে। আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ওর মা সব জানত। সে নাকি দু মাস আগে ব্যাপারটা তুলেও ছিল আমার কানে। আমি হাজার চিন্তার মানুষ। অফিস কারখানা এই সব নিয়ে আছি। তখন কি শুনেছিলাম আর কি বলে ছিলাম কে জানে। এখন এই দুদিন আগে শ্রীমান আমায় বলল, বাবা আমি মঙ্গলবার পিণ্ডারী যাচ্ছি। শুনে তো আমি থ।

—থ? ডাক্তার বোস এবার ভ্রূ কোঁচকালেন। রাগত স্বরে বললেন, অবিনাশ ট্রেকিং বলতে তুমি কি বোঝো?

—কেন, যা তাই। দুর্গম পাহাড়ে মাইলের পর মাইল রোদ-বৃষ্টিতে হাঁটা, যেখানে আশ্রয়ের কোনো ঠিকানা নেই। খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। আছে শুধু পাহাড়, মরণ খাদ আর জঙ্গল।

—ছাই বুঝেছ তুমি। ডাক্তার বোস সুর আরো চড়ালেন। দুর্গম পাহাড়! এটা কি এক্সপিডিশন? দুর্গম পাহাড় তাকেই বলে যে পাহাড়ে চড়তে কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। কাঁটা লাগানো জুতো, দড়ি কিংবা হাতে কুড়োল নিয়ে পথ তৈরী করে উঠতে হয়। উপযুক্ত ট্রেনিং না থাকলে এই ভাবে ওঠা যায় না। আর ট্রেকিং হচ্ছে যেখানে পায়ে চলার পথে শুধু হাঁটতে হয়। এই ভাবে হেঁটে দৈনিক কোনো কসরত না করে বিনা সাজ-সরঞ্জামে যে কেউ বারো তেরো কেন কয়েক জায়গায় চোদ্দ-পনের হাজার ফুট উঁচু পাহাড়েও উঠতে পারে। আর আশ্রয়? আজকাল প্রায় সব পাহাড়ী ট্রেকে সরকারের তরফ থেকে সুন্দর সুন্দর বাংলো তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। পিণ্ডারীতে বলতে গেলে এরকম বাংলো কয়েক পা দূরে দূরেই। যার জন্য এই ট্রেককে বলা হয় লেডিজ ট্রেক।

—লেডিজ ট্রেক ! অবিনাশ বাবু চোখ কপালে তুললেন। মেয়েরা যায় নাকি এ পথে ?

—কোথায় আছ তুমি ? কোন জগতে বাস কর ? ডাক্তার বোস ভ্রূ উঁচিয়ে বললেন—অফিস, কারখানা, শেয়ার আর ডাইরেক্টরস মিটিং নিয়েই থাক। চোখ কান খুলে তার বাইরেটা তো কোনদিন দেখলে না। পিণ্ডারীতে শুধু স্কুলের মেয়ে নয় আমার বয়সী মহিলাকেও যেতে দেখেছি। যাক তোমার সঙ্গে এ সব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। ডাক্তার বোস সৌরভের দিকে ঘুরলেন, তুমি বলো তো বাবা, পিণ্ডারী যাচ্ছ, ট্রেকিংয়ের সব প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র নিচ্ছ তো সঙ্গে।

সৌরভ এতক্ষণ মিটি-মিটি হেসে দুই বন্ধুর ঝগড়া শুনছিল। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ কাকাবাবু সব নিয়েছি। স্লিপিং ব্যাগ, রুক স্যাক, উইণ্ড চিটার সব ভাড়া করেছি আমরা।

—খাবার দাবার ?

—খাবারের মধ্যে মাছ, টিন ফুড ও ড্রাই ফুড গুলো এখানে কিনেছি। চাল-ডাল ভারারিতে কিনব।

—টিন ফুড ও ড্রাই ফুড কি কি নিয়েছ ?

—ককটেল সসেজ, মাটন কারি, চিকেন কিউব, মাখন, আচার, কফি, বিস্কুট এইসব।

—বাঃ তাহলে তো দেখছি তোমরা সবই জান। ডাক্তার বোস আবার অবিনাশ বাবুর দিকে তাকালেন—কি হে, তুমি বলছিলে ওদের নাকি খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। শুনলে তো লিষ্টটা। তোমরা এখানে খাবে যা তার চেয়ে অনেক ভাল ভাল জিনিষ দিয়ে মুখ পালটাবে ওরা সেখানে, বুঝলে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। অবিনাশ বাবু তখনও ফোঁস করে উঠলেন, ডাক্তারের কাছে লোক আসে রোগ সারাতে। আর তুমি যে ওর পাহাড়ী রোগটা বাড়িয়ে দিচ্ছ, সেটা হাড়ে হাড়ে আমি টের পাচ্ছি।

—দেখো অবিনাশ। ডাক্তার বোস এবার সুর নরম করে গম্ভীর ভাবে বললেন, ট্রেকিংকে তুমি যেমন বিপজ্জনক ভেবেছিলে তা যে মোটেই নয়, বুঝেছ নিশ্চয়ই। তবে হ্যাঁ, এতে যেমন রোমাঞ্চকর আনন্দ আছে তেমনি কষ্টও আছে। এই কষ্ট এই বয়েসী সব ছেলে-মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়ায়।

ট্রেকিং কিংবা অভিযান এদের কাছে একটা মস্তবড় শিক্ষা। এতে এরা ভীষণ স্বাবলম্বী হয় এমনকি এদের চরিত্র গঠন পর্যন্ত হয়। তুমি জান, বিদেশে আজকাল পর্বতারোহণ ও এই সব অভিযান-ট্রেকিংকে স্পোর্টস হিসাবে গণ্য করে। কাগজে-কলমে আমাদের দেশেও তা হয়েছে অবশ্য। কিন্তু আমার মতে এখানকার স্কুল-কলেজ গুলো যদি এগুলোকে আরো ভাল ভাবে গ্রহণ করত তাহলে আমাদের যুব-সমাজের এই বেহাল আজ হত না। পথে-ঘাটে এদের চাল-চলন দেখছো তো? অতএব অনর্থক চিন্তা কর না। তোমার ছেলেকে যে রোগ ধরেছে সেটা ওর পক্ষে অনেক শুভ।

—হয়েছে। অবিনাশবাবু ভেতর ভেতর গুমরে বললেন, তোমার লেকচার শুনতে আমি আসিনি। আমি যা বলতে এসেছি এখন দয়া করে শুনবে তুমি?

—বল।

—তুমি যখন একই পথে যাচ্ছ। আর একদিনের মাত্র তফাতে। এই চারটেকে নিয়ে যাওনা সঙ্গে।

—তার মানে! ডাক্তার বোস অবাক হলেন, ওরা কাল যাবে বললে না?

—হ্যাঁ কাকাবাবু। সঙ্গে-সঙ্গে সৌরভ মুখ কাঁচু মাচু করে বলল, আমাদের কালকের টিকিট বহুদিন আগে থেকে কাটা আছে। সেভাবে আমরা প্রস্তুত হয়েছি। এখন বাবা বলছেন, আপনার সঙ্গে যেতে। তা কি কখনো হয়? আপনি বলুন। বাবাকে কিছুতেই আমি বোঝাতে পারছি না যে এ পথে ভয়ের কিছু নেই।

তারপর আরো কিছু বাক-বিতণ্ডা হল দু বন্ধুতে। নরম-গরম কথা। শেষ পর্যন্ত অবিনাশবাবু ক্ষান্ত হলেন। আরো আধঘণ্টা ওঁরা রইল সেখানে। জলখাবার খাওয়া হল। সৌরভ এর মধ্যে ডাক্তার বোসের বুক-শেলফ থেকে পাহাড় সম্বন্ধে লেখা একটা বই পড়ল। তারপর উঠল ওরা।

—তাহলে একে তুমি এই পথ সম্বন্ধে আর কিছু বলবে না ডাক্তার। অবিনাশবাবু ঘুরে বললেন, দেখো আরো কিছু যদি বলার থাকে।

—কিছু বলার নেই। ডাক্তার বোস সৌরভের পিঠে হাত রেখে বললেন, এদের বেশী কিছু বলতে হয় না অবিনাশ। যারা পাহাড়ে ট্রেক করতে যায় তাদের মানসিকতা হয় অন্যরকম। তাছাড়া সব কথা বলব কেন? অজানাকে জানতেই তো আনন্দ। সেজন্যই যাচ্ছে এরা।

—না, আমি ভাবছিলাম। অবিনাশবাবু আস্তে আস্তেই বললেন, দার্জিলিঙে না হয় এর মামা ছিল কিন্তু এখানে—

—এখানে কুলী থাকবে। ভারারীতে গিয়ে ওদের জিনিষ পত্র বইতে নেবে যাকে, সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ওদের।

—আমাদের কুলি ঠিক করা হয়ে গেছে, কাকাবাবু। সৌরভ ওদের গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, আমাদের একবন্ধুর দাদা চিঠি লিখে ঠিক করে দিয়েছেন। উনি একটা মাউন্টেনরিয়েরিং ক্লাবে আছেন। তারই পরিচিত।

—কোন্ কুলি, নাম বলতে পার ?

—ভানুসিং। লোহারক্ষেতের ছেলে। ভারারিতে ওর দাদার নাকি একটা পানের দোকান আছে।

—ভানুসিং ? নামটা চমকের সুরে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার বোস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে চিনি আমি। ও তো ওখানকার এক নম্বর গাইড। কয়েকটা একসপিডিশনেও গেছে। বাঃ ভাল লোক যোগাড় করেছ তো। অবিনাশ, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও গিয়ে ঘরে। এরা যাদের সঙ্গে যাচ্ছে সে তোমার দর্জ্জিলিঙের শ্যালকের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরশীল, বুঝলে।

—কি জানি বাবা, সে তোমরাই জান। অবিনাশবাবুর নির্লিপ্ত স্বর। তবে পরেই উদগ্রীব কণ্ঠে তিনি বললেন। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে না, সেখানে ?

—নিশ্চয়ই হবে। ডাক্তার বোস জোর গলায় বললেন। ওরা যখন পিণ্ডারী থেকে ফিরবে আমি খাতিতে থাকব। দেখা আমাদের হবেই।

তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল দুজন। ডাক্তার বোস মৃদু হাসতে হাসতে বাড়িতে ঢুকলেন। আর একটু পরে তাকেও পিণ্ডারীর গোছ-গাছ শুরু করতে হবে। কম্পাউণ্ডার ছেলেটি আসবে বারোটার পর। একগাদা ওষুধ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করার আছে তখন।

কলকাতা থেকে প্রথমে পাঞ্জাব মেল। তারপর লখনউয়ে নেমে রাত নটায় ছিমছাম ছোট্ট ট্রেন কুমায়ুন একস্প্রেস। সকাল আটটা পঁয়ত্রিশে হলদোয়ানি। অবশ্য ট্রেনটা একটু লেট ছিল বলেই এত দেরী। হলদোয়ানি থেকে বাগেশ্বরের বাস নটায়।

চড়াই উতারইয়ের আঁকা-বাঁকা পথে পাহাড়ী শহর আলমোড়া ও শৈলাবাস কৌসানী ছাড়িয়ে বাগেশ্বরে যখন পৌঁছল বাসটা তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাসের ভীড় এতক্ষণে বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে। একে একে নামল ওরা চারজন। সৌরভ মৃণাল উৎপল ও দীপক।

চারজনেরই বয়েস প্রায় সমান। আশুতোষ কলেজের বি-এসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র। এদের মধ্যে সৌরভ উৎপলের স্বাস্থ্য একই রকম, ছিপছিপে। তবে সৌরভের চেয়ে উৎপল আরো ফরসা। মৃণাল ও দীপক দুজনেই বেঁটে ও দুজনেরই সুঠাম স্বাস্থ্য। মৃণালের গায়ের রঙ কালো। দীপক উৎপলেরই মত ফরসা। বাসের ছাদ থেকে চারটে রুকস্যাক ও চারটে ছোট সুটকেশ নামিয়ে ওরা রাস্তার একধারে এসে দাঁড়াল।

গোমতী ও সরযুর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর একটা ছোট শহর। তবে পাহাড়ী পরিবেশে মোটামুটি জমজমাট। দুপাশে দোকান-পাট, আলো লোকের ভীড়। দোকান গুলোর মধ্যে বেশির ভাগই ছোটখাটো রেস্তোঁরার মত। সৌরভ একটু এগিয়ে একজন দোকানীকে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া ডাকবাংলোটা কোথায় এখানে?

—বিলকুল নজদীগ। সে রাস্তার উত্তরদিকে হাত দেখিয়ে বলল, থোড়া চলা যাইয়ে। দাহিনা ঔর মিলেগা।

ওরা রুকস্যাক গুলো যে যার পিঠে চড়িয়ে সুটকেশ হাতে এগিয়ে গেল। এখানকার ডাকবাংলোর একটা ঘর ওদের নামে বুক করা আছে। কলকাতা থেকে আলমোড়ায় টাকা পাঠিয়ে কাজটা ওরা একমাস আগেই করে রেখেছিল।

উৎপল চলতে চলতে বলল, শোন্। ডাকবাংলোয় গিয়ে একটু জিরিয়ে রুকস্যাক গুলো আজ গুছিয়ে রাখবো।

—নিশ্চয়ই। সৌরভ সমর্থন করল ওকে। আর কখন করব? কাল সকাল সাতটায় ভারারির বাস। ওখানে চাল-ডাল আলু পেঁয়াজ কেনা ছাড়া আর কিছু করা যাবে না।

—তাহলে কালকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু। মৃণাল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওঃ ভাবতে যা ভাল লাগছে। আবার ছ-সাতদিনের জন্য শুধু পাহাড় আর পাহাড়, জঙ্গল আর ঝরণা। কটা দিন দারুণ কাটবে, তাই না রে?

চারজনের মধ্যে এই তিনজনেরই ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতা আছে। সৌরভ গতবার গিয়েছিল সান্দাকফু আর উৎপল ও মৃণাল গিয়েছিল গোমুখ ছাড়িয়ে তপোবন। একমাত্র দীপক অনভিজ্ঞ। তিন বন্ধুর মুখে বার-বার পাহাড়ের গল্প শুনে এবার এ পথে প্রথম সে পা বাড়াল।

মৃণালের কথা শুনে মিনমিন করে বলল দীপক—জানিনা বাবা, তোরা দেখছি বেশ আনন্দে আছিস্। আমি যে শেষপর্যন্ত কি করব কে জানে। ষাট কিলোমিটার পাহাড়ে হাঁটতে হবে, ভেবেই এখন পা আমার জড়িয়ে আসছে।

—কিচ্ছু ভাবিস না। সৌরভ ওকে আশ্বাসের সুরে বলল, হাঁটাটা একবার শুরু হোক তারপর দেখবি কোন্ অদৃশ্য ফুয়েলে তোর গাড়িও সুন্দর চলতে শুরু করেছে।

—তোর মত মনের অবস্থা আমারও গত বছর হয়েছিল রে। উৎপল বলল, গোমুখে যেতে যেতে ভাবছিলাম, কেন এলাম এই কষ্ট করতে। তারপর দেখলি তো, এই ট্রেকিংটার জন্য তিন-চার মাস আগে থেকে কিরকম প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। তোরও তেমনি হবে।

কথা বলতে বলতে তিন মিনিটেই ডাক-বাংলোয় পৌঁছে গেল ওরা। কাগজ-পত্র দেখে চৌকিদার বারান্দার ডানদিকের দরজাটা খুলে দিল। বিরাট ঘর। তিনটে খাট। লাগোয়া বাথরুম। দীপক প্রথমেই রুকস্যাক ও সুটকেশটা এক কোণে রেখে বাথরুমে ঢুকল জল আছে কিনা দেখতে। সেই পরশু কলকাতায় স্নান করার পর গায়ে আর জল পড়েনি। পথে মে মাসের প্যাচপেচে গরম। তার পর এখানে এসেও ঠাণ্ডাটা তেমন জাঁকানো পাওয়া গেল না। অবশ্য বাগেশ্বর আলমোড়া-কৌসানীর তুলনায় অনেক নীচে।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে স্নান সেরে ওরা বাইরে থেকে খেয়ে এল প্রথমে। তারপর রুকস্যাক গুছোতে শুরু করল। এই রুকস্যাক ওদের পিঠে করে বইতে হবে সারা পথ। তাই যেমন দেখতে হবে এটা অনর্থক ভারী না হয় আবার তেমনি কোনো প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ না যায় সেটাও নজর রাখতে হবে। ধীরে-সুস্থে সবই ঢোকাল ওরা। এক প্রস্থ জামা-কাপড় ছাড়া স্লিপিং ব্যাগ, হাওয়া বালিশ, উইণ্ড চিটার, সানগ্লাস, রেনকোট, টর্চ, থালা, মগ, সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি। বাড়তি জিনিষগুলো ওরা সুটকেশে ঢুকিয়ে

নিল। এই সুটকেশগুলো ভারারিতে রেখে যাওয়া হবে। তারপর প্রত্যেকের সুটকেশ থেকে যে অন্যান্য সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো বেরুলো, যেমন টিন ফুড ও ড্রাই ফুড, নাইলনের টেন্ট্, গ্রাউণ্ড শীট, রান্নার বাসন, ছুরি, টিন ওপেনার ইত্যাদি সেগুলো একটা বস্তায় ঢুকিয়ে সেলাই করে নিল ওরা।

এই সব গুছোতে গুছোতে রাত এগারোটা প্রায় হয়ে গেল। তারপর চৌকিদারকে ভোরে ওদের জাগানোর কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

ভারারি থেকে পিণ্ডারি জিরো পয়েন্টের মধ্যে মোট পাঁচটা সরকারী বাংলো আছে। লোহারক্ষেত, ঢাকুরি, খাতি, দোয়ালী ও ফুরকিয়া। সাধারণত পিণ্ডারীর ট্রেকাররা এই ফুরকিয়া বাংলোয় শেষ রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোর হওয়ার অনেক আগে রওনা হয় জিরো পয়েন্টের জন্য। সেখানে সূর্যোদয় ও পিণ্ডারী হিমবাহ দেখে আবার দুপুরের অনেক আগে ফিরে আসে ফুরকিয়ায়। ফুরকিয়ার পরিবর্তে অনেক সাহসী ট্রেকার আরো পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে মার্তোলী গুহাতে শেষ রাত কাটায়। কিন্তু সৌরভদের প্রোগ্রাম তারও পরের। ওদের জিরো পয়েন্টের কাছে পূর্বদিকের ছাঙ্গোছ পাহাড়ের বেস ক্যাম্প অব্দি যাওয়ার কথা। পরিকল্পনাটা উৎপলের দাদা ওদের মাথায় ঢুকিয়েছে। ভদ্রলোক এই এলাকায় দুবার পর্বত অভিযানে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এরাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছেন। যেমন হাল্কা নাইলনের টেন্ট্ কিংবা পাতলা গ্রাউণ্ড শীট যোগাড় করে দেওয়া এবং সব চেয়ে বড় কথা ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প অব্দি যে ওদের ভালভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই কুলি-কাম গাইড ভানু সিংএর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

কিন্তু পরের দিন ভারারিতে পৌঁছে সেই ভানু সিংএর সঙ্গে ওদের দেখা হল না। বাস থেকে নেমে সকাল আটটা নাগাদ তার দাদার পান সিগারেটের দোকানে গিয়ে খবরটা জানল ওরা। ময়লা শার্ট-পাতলুন ও মাথায় পাহাড়ী টুপি পরা মাঝ বয়েসী লোকটা ওদের পরিচয় শুনে হাত জোড় করে মাথা নোয়ালো—হাঁ সাব, আমি ভানু সিংএর বড় ভাই জিত সিং। আপনারা আজ আসবেন আমি জানি। কিন্তু ভানু সিং তো নেই সাব। আপনাদের সঙ্গে অন্য কুলি যাবে। আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি।

তার মানে। ভানু সিংএর অনুপস্থিতির কথা শুনে থমকে গেল সবাই। ওর আবার কি হল? উৎপল চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল—কেন, ভানু সিং কোথায়?

জিত সিং সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হড়বড় করে বলল, ভানু সিং না হলেও আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না বাবু। যে লোককে আমি দিচ্ছি সেও খুব জবরদস্ত আছে, আপনাদের ভালভাবেই নিয়ে যাবে শেষতক।

—কিন্তু ভানু সিং কোথায়? উৎপল আবার জিজ্ঞেস করল, ওর কি শরীর খারাপ?

—না বাবু। জিত সিং এবার মুখ নামাল। একটু কাঁচুমাচু স্বরে বলল, ও দুসরা সাহেবদের সঙ্গে পিণ্ডারী গেছে। আমাকে বলে গেছে আপনাদের কাছে এজন্য মাফী চাইতে।

এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারটা। তার মানে অন্য পার্টি ধরেছে ভানু সিং। কিন্তু ওদের কথা দিয়ে অন্যের সঙ্গে চলে যাওয়া, এ তো খুব অন্যায়। উৎপলের মুখ থমথমে হয়ে গেল। আর যাই হোক ভানু সিং ওর দাদার যোগাড় করা লোক। তাছাড়া দাদা বলেছিল ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প যেতে হলে একমাত্র ভানু সিংকেই নিতে। কারণ ওদিককার পথ-ঘাট ওর খুব ভাল করে চেনা। সে অনুযায়ী পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ওকে উৎপলরা এডভান্স কিছু টাকা আগে থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই টাকা পেয়ে ভানুসিং ওদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে নির্দিষ্ট দিনে সে ওদের জন্য ভারারিতে অপেক্ষা করবে।

উৎপল প্রথমে হতবাক্ হয়ে জিত সিংয়ের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। এবার সে রাগত স্বরে বলল, কি বলছ তুমি! ভানু সিংকে আমরা টাকা পাঠিয়েছি। টাকা পেয়ে সে আমাদের কথা দিয়েছে। তারপর ও চলে গেল অন্যদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ বাবু। জিত সিং ঠোঁটের ফাঁকে লাজুক হাসি এনে বলল, টাকাটা ও আমার কাছে রেখে গেছে।

উৎপলের মেজাজ সপ্তমে চড়ল।—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমি জানতাম পাহাড়িয়াদের কথার খুব দাম থাকে। ধিক্কার দিয়ে সে বলল, এই তার নমুনা।

জিত সিং আর কোনো উত্তর না দিয়ে ব্যাজার মুখে টাকা কটা নিজের জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল ওর দিকে।

উৎপল রাগের চোটে জিত সিংএর বাড়ানো হাতটায় ওর ডান হাতে একটা ধাক্কা মারল—যাও যাও ! ও টাকা তুমি ছিঁড়ে ফেল কুচিকুচি করে। আমরা তোমাদের—'

উৎপল আরো কি বলতে যাচ্ছিল। সৌরভ ওকে থামিয়ে সামনে এসে গম্ভীর কিন্তু একটু নরম স্বরে বলল, কি ব্যাপার বল তো ভাই। আমরা ওর ভরসায় এতদূব এসেছি। আমাদের শুধু পিণ্ডারী নয় আরো এগিয়ে যাব র কথা। আমাদের চিঠি পত্র লিখে ও কি করে গেল অন্যদের সঙ্গে। আমরা কি ওকে বিনা পয়সায় নিয়ে যেতাম।

—বাবু আপনি বিশ্বাস করুন। জিত সিং অনুনয়ের সুরে বলল, এ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে আমার বহোত ঝগড়া হয়েছে। আপনাদের টাকা নিয়ে ও চিঠি পত্র দিয়েছে আমি জানি। কলকাতার এই কেলাব হামারও চেনা আছে। চার সাল আগে এই বাবুদের সঙ্গে আমিই নন্দাদেবী গিয়েছিলাম। সেই বাবুদের সাথে ভানু সিং এরকম নেমকহারামী করল, হামার কি ভাল লেগেছে? আসলে কি হলো জানেন বাবু। দিল্লী থেকে তিন বাবু-সায়েব এসেছে। ওরা এর শির একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। কাল থেকে জোঁকর মত লেগেছিল। টাকা দিয়েছে অনেক বেশী, ব্যস ও চলে গেছে। বাবু এ জন্য আমি খুব শরমিন্দা আছি।

ওর এই ফিরিস্তির মধ্যে আন্তরিক দুঃখের ভাব ছিল। সৌরভ একটু বিরতি নিয়ে বলল, তা বলে এখন আমরা কি করব ?

—আমি তো বলছি বাবু। খুব ভাল লোক আপনার সাথে দেবো। জিত সিং এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর রাস্তায় দূরে দাঁড়ানো একটা ছোট ছেলেকে ইশারায় ডেকে সে বলল, এই যা তো বীরসিংকে ছুটে ডেকে নিয়ে আয়।

উৎপলের রাগ তখনো কমেনি। হাত রেড়ে বলল, না না থাক। তোমাকে আর উপকার করতে হবে না। আমরা ভাল লোক নিজেরাই খুঁজে নেব। —এই চল্ সৌরভ। ওকে ছেড়ে দে। এদের সব চেনা হয়ে গেছে।

সৌরভ ঘুরে বলল, একটু দাঁড়া না। অত মাথা গরম করছিস কেন। এর দোষ কি ? দেখছিস তো ভাইয়ের এই ব্যবহারে লোকটা অনুতপ্ত।

—ছাড়্ ছাড়্। উৎপল মুখ বেঁকিয়ে বলল, ও সব গট আপ কেস।

ভানু সিং ভাল মালদার পার্টি পেয়ে চলে গেছে। এ এখন আরেক ভাইকে আমাদের সঙ্গে ভেড়াতে চাইছে।

—না বাবু, আপনি ভুল বলছেন। কথাটা উৎপল বাংলাতে বললেও তার অর্থ বুঝতে পেরে জিত সিং নম্র স্বরে বলল, আমি আমার দোকান নিয়ে থাকি। এ সবের সঙ্গে আমার আ কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন, আমার ভাই এরকম বেইমানী করল। তাই একটা ভাল ছেলে দিচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধে না হয়। এই ছেলেটা আমার ভাই তো নয়ই। কোনো রিস্তেদারও নয়।

সৌরভ ও মৃণাল এবার ধমক দিল উৎপলকে।

উৎপল ওদের ধমক হজম করে বলল, ঠিক আছে তাই যদি হয় তো তুমিই চল না আমাদের সঙ্গে। নন্দাদেবী গিয়েছিলে বলছ। তোমারও নিশ্চয়ই সব চেনা ওদিকে।

জিত্ সিং কথাটা শুনে করুণ ভাবে হাসল একটু। হেসে বলল, হ্যাঁ বাবু আমিই যেতাম। কলকাতার বাবুদের সঙ্গে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু কি করব বলুন, নন্দাদেবী যে আমার ওপর বিরূপ। এই দেখুন। ব'লে দোকানের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে থাকা অবস্থাটাকে পরিবর্তন করে ডান পাটা পেছন থেকে নামাল সে। ওরা প্রত্যেকেই সেই পা দেখে চমকে উঠল। জিত্ সিংয়ের ডান পায়ের পাতাটা পুরোপুরি নেই।

প্রায় গোড়ালি হীন পাটার দিকে তাকিয়ে সৌরভ জিজ্ঞেস করল, তাহ'লে তুমি নন্দাদেবী কি ক'রে গিয়েছিলে?

—ওখানে যাওয়ার সময় সব ঠিক ছিল বাবু। জিত সিং আবার সেই ছোট্ট হাসিটা হেসে বলল, কিন্তু নন্দাদেবী-ই পায়ের এই অবস্থা করেছে। আমার ফ্রষ্ট-বাইট হয়েছিল। পুরো পাটাই বোধহয় বাদ দিতে হত। কিন্তু তখন অশোকবাবু, সেনবাবু, ঘোষবাবু ছিল বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। ওরা আমায় প্রায় কাঁধে করে বাগেশ্বর হাসপাতাল অব্দি নিয়ে এসেছিল। তাই আপনাদের আমার খুব ভাল লাগে বাবু। বলতে বলতে জিত সিং সামনের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলে—ওই যে বীর সিং এসে গিয়েছে। খুব ভাল ছেলে। এও ওদিককার সব পথ-ঘাট চেনে। আপনারা নিশ্চিন্তে ওকে নিতে পারেন।

ওরা তাকিয়ে দেখল। কুড়ি-বাইশ বছরের ফরসা লম্বা একটি ছেলে।

মাথায় নীল রঙের টুপি। গায়ে ফুলহাতা সবুজ ময়লা সোয়েটার। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভারারি থেকে লোহারক্ষেত সতেরো কিলোমিটার। প্রথম সাড়ে পনেরো কিলোমিটারের মত রাস্তায় বিশেষ কোনো ওঠা-নামা নেই। নদীর ধারে ধারে ডান দিকে ছোট-ছোট পাহাড়ের প্রাচীর ঘেঁষে মোটর যাওয়ার পথ। প্রায় তেরো কিলোমিটার গিয়ে একটা অসম্পূর্ণ ব্রীজ। তারপর নদীকে ডানদিকে রেখে বাঁ পাশের পাহাড় ঘেঁষে আবার রাস্তা মোটামুটি সমান। শুধু শেষ দেড় কিলোমিটার হঠাৎ চড়াই। সৌরভরা ভারারিতে কেনা-কাটা সেরে একটা রেষ্টুরেণ্টে মাছ-ভাত খেয়ে দুপুর এগারটা নাগাদ বেরিয়েছিল। লোহারক্ষেত বাংলোয় পৌছল বিকেল সাড়ে চারটের একটু পরে।

পাহাড়ের কোলে দু কামরার বাংলোটা দেখতে খুব সুন্দর। চারপাশে লনের মত এক টুকরো জমি। ওদের কপাল ভাল। একটা কামরা খালি। আরেকটা পিণ্ডারি ফেরত একটি দলের দখলে।

বীর সিং আগেই ওদের বস্তাটা পাশের ঘরে ঢুকিয়ে রেখেছে। ওরাও একে একে ঢুকে রুকস্যাক গুলো রাখল। কার্পেটে মোড়া মেজের ওপর দুটো নেয়ারের খাট। একটা টেবিল। তিন-চারটে চেয়ার। বাথরুম বেসিন কমোড সব আছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখে চমৎকৃত হল দীপক। পাহাড়ে হাঁটতে এসে এতটা সে আশা করেনি।

সৌরভ ও মৃণাল তখন বাইরের বারান্দায় বসে জিরোচ্ছে আর লোহারক্ষেতের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। বাংলোর সামনেটুকু ছাড়া তিনদিকেই পাহাড়। পেছনে ও দুপাশে। ওদের ডান দিকের পাহাড়ের খাজেঁ খাজেঁ কতগুলো ছোট ছোট বাড়ি। তার মধ্যে একটা মন্দিরও আছে। আরও ওপরে সিঁড়ির মত করে কাটা টুকরো টুকরো জমিতে ছোট-ছোট ক্ষেত আলু কিংবা অন্য কিছুর।

উৎপল তখন বাংলোর সামনে কোমর সমান উঁচু ইটের প্রাচীরের ওপর বসে পিণ্ডারি ফেরত দলের একজনের সঙ্গে গল্প করছে।

বীর সিং এল সৌরভদের কাছে, বাবু চায় কা সামান দিজিয়ে। আওর রাত মে কেয়া খানা পাকেগা।

রেশন-মাষ্টার মৃণাল ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বস্তাটা খুলতে।

তার কুড়ি মিনিট পরেই চা ও বিস্কুট নিয়ে ঘরে গোল হয়ে বসল তিনজন। সৌরভ, মৃণাল ও দীপক। উৎপল সবশেষে এল ঘরে। ওর মগে সৌরভ চা ঢেলে দিল।

—ভদ্রলোক বললেন, ফুরকিয়ার পরে এখনো অনেক জায়গায় বরফ আছে। উৎপল ওদের মাঝখানে বসে বলল, ওরা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

খবরটা ওদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এ বছর এই সব অঞ্চলে প্রচুর বরফ পড়েছে সে কথা ওরা আগেই শুনেছে। কিন্তু তা বলে পিণ্ডারি জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়া যাবে না? এত বরফ! অথচ আজ জুন মাসের শুরু এটা!

উৎপল তারপর বলল, এরা অবশ্য সব বয়স্ক লোক। বেশী ঝুঁকি নেননি। বললেন দোয়ালীর পর থেকে এই বরফের জন্যই নাকি অপূর্ব দৃশ্য পাওয়া যাবে।

—তা হোক, কিন্তু জিরো পয়েন্ট কিরে, আমরা ছাঙ্গোছ অব্দি যাব। হবে তো শেষ পর্যন্ত? দীপক আশঙ্কা প্রকাশ করল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। মৃণালের দৃঢ় স্বর। প্রথম কথা, আরো দু দিন পর আমরা ওখানে পৌঁছচ্ছি। এর মধ্যে কিছু বরফ গলবে। তারপর আমাদের প্রত্যেকের ক্লাইম্বিং শু আছে চিন্তা কি?

সৌরভও তাই বলল। উৎপল তো আরো বেপরোয়া। এই নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর উৎপল হঠাৎ বলল, জানিস এই ভানু সিং বেটা আজকেই ভারারি থেকে রওনা হয়েছে। আমরা যখন ভারারিতে নামলাম। তার একটু আগেও নাকি ওরা ওখানে ছিল।

—কে বলল? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—এই বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে বীর সিংয়ের কথা হচ্ছিল। ভানু সিং নামটা শুনেই আমি জিজ্ঞেস করলাম। বীর সিং বলল তিনটে শিখ ছেলে ও একটি নেপালীর সঙ্গে ও গেছে। এখানে এসেছিল দুপুর দুটোর একটু আগে। খাবার খেয়ে তারপর ঢাকুরীর দিকে এগিয়ে গেছে।

—বাব্বাঃ একদিনে আঠাশ কিলোমিটার! দীপক চোখ বড় বড় করে বলল, তুর্দান্ত ট্রেকার তো!

—মোটেই না। উৎপল মুচকি হাসল। পিণ্ডারি ফেরত ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের। উনি বললেন এই হাঁটার ধকলে একজন পথে প্রায় কাত হয়েছে। প্রচণ্ড পেট ব্যাথা নাকি তার। ভদ্রলোক বরং বললেন নেপালীকে বাদ দিয়ে ওই তিনজনের কাউকেই নাকি ঠিক ট্রেকার বলে মনে হয় না।

—ছাড়্ ওদের কথা। সৌরভ প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, চল বাইরে গিয়ে বসি।

চেয়ারগুলো নিয়ে ওরা বাইরে বারান্দায় এল। তারপর বসে বসে আজকের হাঁটার অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প শুরু করে দিল সব।

দীপক বেশ উচ্ছ্বসিত এখন। জীবনে এতটা পথ প্রথম হাঁটল সে। কষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু এই কষ্টার্জিত আনন্দের স্বাদ যে কত রোমাঞ্চকর সেটা এখন সে অনুভব করতে পারছে। পথের ক্লান্তি অনেক আগে উবে গেছে। এখন সেই পথ নিয়ে গল্প করতে বড় ভাল লাগছে ওর।

লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরী এগারো কিলোমিটার। এর মধ্যে সাড়ে ন' কিলোমিটারই চড়াই। সকাল সাড়ে ছটায় বীর সিংয়ের তৈরী মিল্ক পাউডার গোলা তুধে কর্ন ফ্লেকস মিশিয়ে আর মাখন-পাউরুটি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

বাংলোর পেছনদিকে ডান কোণ ঘেঁষে পাহাড়টায় উঠতে হবে ওদের। একেবারে চুড়োয় পাথর বাঁধানো দেয়ালের মত কিছু দেখা যাচ্ছে। মুখ তুলে সেদিকে তাকিয়ে মৃণাল দীপককে বলল, কি রে ঘাবড়ে যাচ্ছিস নাকি?

—না। দীপকের স্বরে আত্মবিশ্বাসের আভাস, চল্। ওরা এগিয়ে গেল। আঁকা বাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে ওই দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে লাগল প্রায় আধ ঘণ্টা। ওটা আসলে দেয়াল নয়। পাহাড়ী রাস্তার ধ্বস-প্রতিরোধক অবলম্বন। ওর ওপর দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল ওরা। লোহার ক্ষেত গ্রামটা অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে। ছোট বড় কয়েকটা পাকা বাড়ি। তার মধ্যে নীল রঙের বাংলোটা মধ্যমণি যেন। দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে

নিয়ে আবার চলা শুরু হলো। সামনে ফের চড়াই। তবে আগেরটার মতো অত খাড়া নয়।

তারপর টানা দেড়ঘণ্টা হাঁটা। ঘন জঙ্গল। ঝর্ণা। পাখির ডাক। হঠাৎ একটা মাইল স্টোনের কাছে এসে থেমে গেল সবাই। রাস্তার বাঁ পাশে একটা শিলা-খণ্ডের তলায় গুহার মধ্যে চা তৈরী হচ্ছে। কাঠের উনোনের পাশে পথিকের আশায় পথ চেয়ে বসে আছে এক কুমায়ুনী বধূ। কোলে তার বাচ্চা। দীপক মুখ থেকে তৃপ্তির একটা শব্দ করে বসে পড়ল সেখানে। বাকীরাও বসলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এল পাঁচ ছ' বছরের একটি শিশু। ওর তৎপরতা দেখে বোঝা গেল এই নির্জন টি কর্ণারের সেই হল বেয়ারা। অর্থাৎ ওই কোলের বাচ্চাটির দাদা সে।

ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে দীপক মৃদু হেসে হিন্দীতে বলল, হ্যাঁ চা চাই। কিন্তু তার আগে জল খাওয়াতে হবে ভাই। বলে ওর খালি ওয়াটার বটলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

একটা ঝর্ণার পাশেই সেই টি কর্ণার। ছেলেটা বোতলটা নিয়ে নিমেষেই ভরে আনল জল। কী যে টলমলে পরিষ্কার আর মিষ্টি! প্রায় এক ঢোকেই দীপক পুরো বোতলটা শেষ করল।

তারপর চা খেয়ে আবার হাঁটা।

বীর সিং বলল, আমি এবার এগিয়ে যাই বাবু। ঢাকুরীতে গিয়ে আপনাদের খাবার তৈরী করে রাখছি।

মৃণালের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিমেষেই সামনের জঙ্গলে অদৃশ্য হল। ওকে মৃণাল আগেই বলে দিয়েছে লাঞ্চে আজ কি খাওয়া হবে।

ঢাকুরী পৌঁছনোর আগে অর্থাৎ প্রায় দশ কিলোমিটার পর যেখানে থমকে দাঁড়ায় সবাই, সেখানেই দীর্ঘ চড়াইয়ের ইতি। দাঁড়ানোর কারণ অবশ্য তা নয়। চড়াই-উতরাইয়ের এই সঙ্গমস্থলে এসে সামনে যা নজরে পড়ে সেটা বোধহয় পিণ্ডারি পথের প্রথম দুর্লভ দৃশ্য।

তাই সৌরভদেরও দাঁড়াতে হল।

সামনে বিরাট এক উপত্যকা। ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত তুষার শ্রেণী। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল। ডানদিকে পাহাড়। এখানে পথ হঠাৎ নীচের দিকে

নামতে শুরু করেছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে বহু নীচে দেখা যায় সবুজ এক গালিচার ওপর ঢাকুরীর নীল রঙের বাংলোটা। অপূর্ব দৃশ্য।

পথের সঙ্গে ওরাও নামতে শুরু করল। সেই বাংলোয় পৌঁছতে লাগলো পুরো চল্লিশ মিনিট। পাহাড়ের কোলে এক টুকরো সমতল জায়গা। তার ওপর বাংলোটা এই নির্জন এলাকার যেন এক স্বপ্নপুরী।

বীর সিং কথামত সব করে রেখেছে। ঢাকুরীর লনে চেয়ারে বসে মিনিট দশেক কাটানোর পর ওদের লাঞ্চ চলে এল। পেঁয়াজ-লঙ্কা-নুন দিয়ে মাখা ছাতু, চিলি সস্ আর ককটেল সসেজ। দুপুরে যেখানে রান্না করার জন্য সময় পাওয়া যাবে না সেখানে এই মেনু। গত রাতে বীর সিংয়ের তৈরী খিচুড়ী মাখন ও পাঁপড় ভাজা খেতে দারুণ লেগেছিল। আজকের খাবার অত সুস্বাদু না হলেও খারাপ লাগল না। সবচেয়ে বড় কথা এই খাবারে পুষ্টি আছে। যা চলার পথে শক্তি জোগায়।

সৌরভের খাওয়া শেষ। চামচ ও থালাটা ধোয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠল সে। বাংলোর পেছন দিকে কিচেনের কাছে জলের নল। সেদিকেই যাচ্ছিল, হঠাৎ বাঁ দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। একটা লোক নীচের রাস্তা দিয়ে উঠে বাংলোর সীমানায় ঢুকে ওর কাছেই কি যেন জিজ্ঞেস করার জন্য আসছে।

লোকটা স্থানীয়। বয়েসে তরুণ। গায়ের পোশাক-আশাক দেখে মনে হয় চৌকিদার বা গাইড গোছের কেউ। সৌরভের কাছে এসে বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবু আপনারা আজ লোহারক্ষেত থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। সৌরভ উত্তর দিল।

চোখ ফিরিয়ে অদূরে চেয়ারে বসা উৎপল-মৃণালদের দিকে সে তাকাল। তারপর সৌরভের দিকে আবার ঘুরে বলল, আপনাদের আগে আর কেউ এসেছে ওদিক থেকে?

—না এখনও কেউ আসে নি।

—তাহলে আপনারা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। লোকটা উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বলল ওপরে মন্দিরে একটা চামড়ার থলি। কালো মত। পান নি?

—কোন্ মন্দিরে? সৌরভ ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে অবাক হল। লোকটা যেমন চিন্তিত তেমনি ভীত-সন্ত্রস্ত। ওপরের দিকে হাত তুলে ইশারা

করে এরপর যা বলল সে, তাতে বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগে এই বাংলোর জন্য যেখান থেকে ওরা নামতে শুরু করেছে সেই জায়গাটার কথা বলছে। সৌরভের এখন মনে পড়ল ওই চুড়োর একপাশে কিছু পাথরের চত্বরের মত সাজানো দেখেছিল সে। তার ওপর পতাকার মত কয়েকটা কাপড়ের টুকরো অর্থাৎ ওটাই মন্দির। কিন্তু সেখানে থলি-টলি তো ছিল না।

—না কোনো থলি ওখানে দেখিনি। সৌরভ ভাবতে ভাবতে বলল, তুমি কখন ছেড়ে এসেছ ওটা ওখানে?

—কাল রাত কো বাবু। লোকটা বিমর্ষ স্বরে বলল, আপনার বন্ধুরা কেউ পেয়েছে কিনা একটু জিজ্ঞেস করবেন?

—না ওরাও পায়নি। আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। তবে তুমি আমাদের কুলিকে জিজ্ঞেস করতে পার। ও আমাদের আগে এসেছে।

লোকটা এই কথা শোনা মাত্র ছুটতে ছুটতে কিচেনের দিকে চলে গেল।

উৎপলরাও তখন উঠে এসেছে থালা হাতে। ওরা ব্যাপারটা সৌরভের কাছ থেকে জানল। হাত-মুখ থালা ধুয়ে ওরা আবার বসল চেয়ারে। আর মিনিট পনেরো-কুড়ি জিরিয়ে আবার হাঁটা শুরু করতে হবে।

কিন্তু তার আগেই সেই লোকটা আবার এল ওদের কাছে। তবে এবার খুব অপ্রস্তুত ভাব। আড়ষ্ট পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এসে চোরা চাহনিতে তাকাল সে সবার দিকে। তারপর প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে সৌরভকে বলল, বাবু আপনার কুলিটাই পেয়েছে ওই থলি। কিন্তু ও স্বীকার করছে না। আপনি যদি মেহেরবানি করে ওকে একটু বলেন—

—তুমি কি করে বুঝলে ও পেয়েছে? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—ওর চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে বাবু। চৌকিদারও বলল, কাল রাতে আমাদের আসার পর বীর সিংই নেমেছে ওপর থেকে।

—আচ্ছা কাল রাতে থলিটা ফেলে এসে এত দেরীতে ওটার খোঁজ করছ কেন? মৃণাল জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে ভায়া তুমি এতক্ষণ?

—আমি আর কি বলব বাবু। লোকটা এবার দুঃখু করে বলল, যার থলি ওরেই ইয়াদ এসেছে খাতিতে গিয়ে। ওটা ছিল অবশ্য আমার কাছেই। লেকিন ওই বাবুর তবিয়ত খারাপ হয়ে যাবার পর কখন যে তিনি ওটা আমার মাল-পত্তরের সঙ্গে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, খেয়াল করি নি। কাল অন্ধকারে

ওখানে বসে তারপর ফেলে এসেছি। সব দোষ নাকি আমার। এখন যদি না পাই, বাবুরা আমার গরদান কেটে নেবে।

—তোমার নাম কি ? হঠাৎ উৎপল জিজ্ঞেস করল।

লোকটা মাথা নামাল। জুতোর মুখ দিয়ে মাটি আলতো ভাবে ঠুকতে ঠুকতে বলল, জী ভানু সিং।

পরস্পরের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চারজনই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরব হয়ে গেল। ওরা সবাই তারপর আরো ভাল করে ভানু সিংকে দেখল আপাদমস্তক। শেষপর্যন্ত উৎপল শক্ত শরীরে কঠিন স্বরে বলল, আচ্ছা তুমি তাহলে ভানু সিং। আমরা কে জান ?

ভানু সিং আরেকবার লজ্জিত চোখে তাকাল সবার মুখে। তারপর হঠাৎ মাটিতে বসে হাত-জোড় করে বলে উঠল, হ্যাঁ জানি বাবু। বীর সিং বলেছে। আপনারা আমাকে মাফ্ করে দিন বাবু। আমি নেমক হারাম, বেইমান তা নাহলে সিরিফ পয়সার লালচে এই কাজ করতাম না। লালচ করে খুব পশতাচ্ছি এখন বাবু। কি গলতি যে করেছি হাড়ে-হাড়ে আমি টের পাচ্ছি। আপনারা আমাকে মাফ্ করে দিন।

ভানু সিঙ্গের তাৎক্ষণিক এই প্রতিক্রিয়া আশা করেনি কেউ। এমন কি ক্রুদ্ধ উৎপল পর্যন্ত ঘাবড়ে গেল। তবু সে একটু পরেই কর্কশ স্বরে বলল, বুঝেছি, থলিটা পাওয়ার জন্য এই ভোল পালটেছ তুমি। কিন্তু আমরা অত সহজে ভোলবার নই। দাদাকে গিয়ে আমি বলব তোমার কথা। ওরা তো তোমার কাছে কোনো লোক পাঠাবেই না। নিজেরাও আর তোমাকে নেবে না। ছি ছি কটা পয়সা বেশী পাবে বলে তুমি নিজের জবান ভুলে গেলে ?

—বাবু, তার সাজা আমি ভোগ করছি এখন। ভানু সিং নত মস্তকে বলল, আপনারাও এ জন্য সাজা দেবেন, নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু নন্দা দেবীর কসম খেয়ে বলছি বাবু কাল সারাদিন আমি আপনাদের কথা খুব ভেবেছি। এই তিনটে শয়তানের সঙ্গে বেশী পয়সার লালচে না এসে আপনাদের সাথে এলে কত যে ভাল হত আমি নিজেই তা হরবখত মনে করছি। পয়সা সব সময় দেখতে হয় না বাবু মানুষও দেখতে হয় এই শিক্ষা আমার হয়ে গেছে।

শেষ কথাটা বলতে বলতে ভানু সিং-এর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। দেখে

সৌরভ একটু অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞেস করল, কেন যাদের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ, এরা লোক ভাল নয়?

—না বাবু বিলকুল খারাপ। ভানু সিং মুখ তুলে বলল, এদের বাতচিত হাব ভাব আমার একদম ভাল লাগে না। কত রকম বাবুর সাথে আমি এ রাস্তায় এসেছি কিন্তু এরা বিলকুল অন্যরকম। কাল তো এখানে সবাই দারু খেয়েছিল তারপর খাতিতে গিয়ে যখন টের পেল থলিটা নেই, তখন তো ওদের মধ্যে একেবারে হাল্লা লেগে গেল। এক বাবু তো থলির বাবুকে মেরেই ফেলে আর কি? তারপর চোটপাট হল আমার ওপর। বলেছে থলিটা না পেলে ওরা আমাকে এক পয়সা দেবে না। উলটে চোরের দায়ে পুলিসে দেবে।

—কেন কি আছে ওই থলিতে, পয়সা-কড়ি? প্রশ্নটা করল দীপক।

—আমি কিছু জানি না বাবু। তবে জরুরী কুছ আছে নিশ্চয়ই। ভানু সিং ওর কাতর মুখখানা দুলিয়ে বলল, জো ভী হো কাল রাতে যখন আমরা ওপর থেকে নামলাম কি আজ যখন এখান থেকে রওনা হচ্ছিলাম তখনও যদি খেয়াল করত, আমার এতো তকলীফ হত না। আজকেই খাতি গিয়ে সেই খাতি থেকে ছুটে আসছি বাবু। আবার দৌড়ে ওদের বোধ হয় দোয়ালীর আগে ধরতে হবে।

ভানু সিং-এর কথা বলার ঢঙ আর হাব-ভাব ওদের সহানুভূতি কেড়ে নিল। সৌরভ উঠল চেয়ার থেকে। উৎপল আর কিছু বলল না। দুজন চলে গেল কিচেনের দিকে।

প্রায় দশ মিনিট পর ফিরল ওরা। ভানু সিং-এর কাঁধে তখন কালো রঙের একটা চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগটা খুব একটা বড় নয় তবে বেশ দামী। দেখে মনে হল বিদেশী। ভানু সিং-এর নিশ্চিন্ত মুখ।

উৎপলের কাছে এসে হাত জোড় করে সে বলল।—বাবু আপনারা বাঁচালেন আমাকে। এই থলি যদি না পেতাম কি ছিল নসীবমে কে জানে। একটু হেসে সে আবার বলল, আমি যাচ্ছি বাবু, কিন্তু যাওয়ার সময় আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি পরশু থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকব। না, এর জন্য কোনো পয়সা-টয়সা আমাকে দিতে হবে না। আমি বাত না রেখে যে পাপ করেছি তা এই ভাবেই আমাকে ধুতে দিন। পরশু থেকে আপনারা যতদিন না ভারারি ফিরছেন ততদিন আমি আপনাদের সাথে থাকব।

—বাঃ সে কি করে হয়। সৌরভ একটু অবাক হয়ে বলল, তুমি এখন অন্যদের সঙ্গে আছ, আমাদের সঙ্গে আবার থাকবে কি করে?

—ওদের সাথে আমার কালকেই শেষ দিন বাবু। ভানু সিং আলতো হেসে বলল, কালকের দিনটা গেলেই আমার নিষ্কৃতি। তারপর আমি আপনাদের সাথ নিব।

—এ আবার কেমন কথা। মৃণাল বলল, তুমি ওদের সঙ্গে ফিরে যাবে না?

—না বাবু। ভানু সিং মাথা নেড়ে বলল, ওরা আমাকে কাল পর্যন্তই নিয়েছে। আজ ফুরকিয়া। কাল গ্রেসিয়ার। ব্যাস তারপর আমার ছুট্টি।

—তারপর ওরা কি করবে? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—কি করবে ওদেরই মালুম বাবু। আমি কিছু জানি না। তবে ওদের সঙ্গে একজন নেপালের লোক আছে।

মৃণাল জিজ্ঞেস করল, তোমরা তো খুব লম্বা লম্বা ট্রেক করছ। একদিনে ভারারি থেকে ঢাকুরী আরেক দিনে ঢাকুরী থেকে একেবারে ফুরকিয়া! বাবা সাংঘাতিক ব্যাপার!

—হ্যাঁ বাবু। ভানু সিং কপাল কুঁচকে বলল, কি যে ওদের জলদি আছে ভগবান জানে। দু বাবু তো পারছে না তবু ওরা নাকে দম নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে।—আচ্ছা, আমি যাই বাবু। বহোত দূর যেতে হবে। আপনাদের সাথে ফুরকিয়াতে দেখা হবে। আমি থাকব সেখানে—জরুর। বলে সে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথেই ছুটতে ছুটতে চলে গেল আবার।

ওরা আবার তাকাল পরস্পরের দিকে। অদ্ভুত লোক তো ভানু সিং। লোকটার ওপর চটে ছিল ওরা কিন্তু এখন ওকে ভালই লাগছে।

রাস্তার ঢালে সে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সৌরভ উৎপলের দিকে তাকিয়ে বলল, ওই থলিটা বীর সিং মজা করার জন্য ভানু সিংকে দিচ্ছিল না। দুজন তো এমনিতে দেখলাম খুব বন্ধু।

—কিন্তু ছেলে গুলোর কি ব্যাপার বল্ তো? দীপক বলল, ওরা ওভাবে ঘোড়ার মত ছুটছে কেন?

—ছুটতে দে। আমাদের কি। উৎপল চেয়ার থেকে উঠে বলল, চল্ এবার আমাদেরও ছুটতে হবে।

ওর কথা শুনে সবারই সম্বিত ফিরে পেলো। তাইতো আর দেরী করলে যে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে উঠল সবাই। রুক স্যাক গুছোতে শুরু করল।

ঠিক তখনই বীর সিং ছুটে এল কিচেন থেকে ওর হাতে কালো রঙের খামের মত কিছু! বললো, বাবু ভানু সিং চলে গেছে?

খামটার দিকে তাকিয়ে সৌরভ বলল, হ্যাঁ চলে গেছে। কেন?

খামটা দেখিয়ে সে বলল, এই লিফাফাটা ও ফেলে গেছে।

—কোথায় ছিল এটা? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—থলিটার ভেতর ছিল।

—সে কি, থলিটা খুলে ছিলে নাকি তুমি?

বীর সিং মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ বাবু। কি জিনিস আছে দেখার জন্য খুলেছিলাম। তারপর সব ঢোকাতে গিয়ে এটা ভুলে গেছি।

—কি এটা? উৎপল এগিয়ে এল।

—জী এক ফোটু।

উৎপল খামটা নিল ওর হাত থেকে। তারপর ফ্ল্যাপটা খুলে ভেতরের ফটোটা বের করল। সবাই ঝুঁকে পড়ল এক সঙ্গে। একটি বিদেশী তরুণীর মুখ। গলা পর্যন্ত তোলা। সুন্দরী। রঙীন ছবি থেকে যেন ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার অনাবিল হাসি। শার্ট পরা। কলার দুটো দেখা যাচ্ছে। তার নীচে সরু একটা হার।

—কি ব্যাপার? এই ছবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে! উৎপল অবাক হয়ে বলল, পাহাড়ে বেড়াতে এসে—

—আহা, ছেলেটার পরিচিত কেউ হবে। মৃণাল এবার বীর সিংকে জিজ্ঞেস করল, ওই থলিতে আর কি ছিল?

—জী খাস কিছু নয়। বীর সিং জবাব দিল, দস্তানা মোজা, দাওয়াই আর একটা বিলীতী শারাবের বোতল ছিল।

—পয়সা মানি-ব্যাগ কিছু ছিল না?

—না বাবু।

মৃণাল তাকাল সৌরভের দিকে—আশ্চর্য, তাহলে কি এমন জিনিষ ছিল ওর মধ্যে যার জন্য লোকগুলো ওর ওপর এত জুলুম করল।

—সে তারাই জানে। সৌরভ রুক স্যাকটা পিঠে উঠিয়ে বলল, নে চল এবার। আর দেরী করিস না।

উৎপল ছবিটা খামে পুরে বীর সিংকে বলল, ঠিক আছে এটা আমাদের কাছে থাক। ওদের সঙ্গে দেখা হলে দিয়ে দেব। বলে খামটা নিজের রুক স্যাকে ও ঢুকিয়ে নিল। বীর সিং চলে গেল কিচেনের দিকে।

ঢাকুরীর পর থেকে আবার রাস্তাটা নেমে গেছে। দূরের তুষার শ্রেণীকে প্রথমে ডানদিকে রেখে ওরা বেশ এঁকে-বেঁকে দ্রুতবেগে অনেকক্ষণ পা চালাতে পারল। ঢাকুরী বাংলো থেকে খাতি আট কিলোমিটার। প্রায় চার কিলোমিটার তার মধ্যে ঢাল। এই ঢালের পর একটা ছোট পাহাড়ী নদী। নিঝুম জঙ্গল ঘন হয়ে এসেছে এখানে। নদীর ওপর একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়। ওই পাহাড়টাকে বেষ্টন করে এবার ওদের ওপারে উঠতে হবে।

সেতুর ওপর এসে দাঁড়াল চারজন। সামনে-পেছনে পাহাড়ের আড়াল বলে এখানে আধো-আধো অন্ধকার। তার সঙ্গে নিস্তব্ধতা। পাহাড়ী নদী জঙ্গল এই নিঝুন পরিবেশ মিশে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ওরা ইচ্ছে করেই কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ। দূরে হঠাৎ একটা পাখি শিস দিয়ে উঠল।

সৌরভ দীপকের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কি রে কেমন লাগছে?

দীপক বিভোর হয়ে তাকিয়ে ছিল নদীর জলের দিকে। সেই জলও যেন বোঝে এই মৌন পরিবেশের মাধুর্য্য। পাথরের গা বেয়ে-বেয়ে নিঃশব্দেই বয়ে চলেছে। দীপক ঘুরে বলল, আমি এখন ভাবছি আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গী-এসপ্ল্যানেড কথা। কি উল্টো ছবি বল! ওখানে কোলাহলের তুলকালাম এখানে সব নিঝুম। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মন জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ওরা পেছন ফিরে তাকাল। বীর সিং বস্তা পিঠে জোর পা চালিয়ে আসছে। ওদের দিকে হেসে একবার তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল। এই পাহাড়ী মানুষদের চলার ছন্দই আলাদা। এত মাল বয়েও পরে বেরিয়ে আগে পৌঁছবে খাতিতে।

ওরাও চলতে শুরু করল আবার। সামনে চড়াই। তবে খুব কঠিন নয়।

কিছু ওপরে উঠে দূরে বাঁ দিকের পাহাড়ের কোলে দেখা গেল একটা ছোট্ট গ্রাম। তার নীচ দিয়েই বয়ে গেছে সুন্দরডুঙ্গা নদী। ওখানে কোথাও পিণ্ডারি নদীও মিশেছে ওর সঙ্গে। নদীর আবছা একটা রেখা নজরে পড়ল। বাঁ-পাশের পাহাড় আর ওদের পাহাড়ের মাঝখান দিয়েই যে পিণ্ডারি বইছে সেটা সৌরভ ম্যাপ দেখেই বুঝতে পারল। কিন্তু এখানে খুব তলায় সে নদী। গভীর খাদ বলে কিছু দেখা যায় না। ওই গ্রামটার নাম নিশ্চয়ই ওয়াছাম। ওদের উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে সেদিকে। ওই রাস্তাটাও খাতি থেকে এসেছে। যাচ্ছে ওয়াছাম আর সুন্দরডুঙ্গার দিকে। ম্যাপটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর আবার ওরা পা বাড়াল।

আর ঘণ্টা দেড়েক পা চালাতেই এসে গেল খাতি গ্রাম। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকেই গ্রামটা নজরে পড়েছিল। নীচের ঢাল থেকে ছোট-বড় বাড়িগুলো উঠে গেছে ওপরে। পেছনে দূরের তুষার শৃঙ্গ। পূর্ব দিকে খাড়া শিলায়িত পাহাড়। পশ্চিমে ছোট-ছোট চাষের জমি তারপর আবার পাহাড়। পিণ্ডারি নদীটা পূর্বদিকে খাড়া পাহাড়ের একেবারে তলায়।

পুরো গ্রামটাকে বাঁ দিকে রেখে ওরা একেবারে তার মাথায় অবস্থিত বাংলোটায় যখন ঢুকল তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

বীর সিং রান্নাঘর থেকে ওদের গলায় আওয়াজ শুনে চায়ের ডেকচি চাপিয়ে দিল উনোনে।

সৌরভরা যখন খাতি বাংলোয় ওদের আজকের যাত্রা শেষ করল, একটি শিখ যুবক তখন তার সমবয়সী এক শেরপা তরুণের সঙ্গে দোয়ালী বাংলো পেরিয়ে ফুরকিয়ার দিকে এগুচ্ছে। ছেলেটির মাথায় আঁট-সাঁট পাগড়ী। মুখ প্রায় অর্ধেকটাই চাপ কালো দাড়িতে ঢাকা। গায়ে লাল উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেট। চোস্ত প্যাণ্ট। পিঠে রুক-স্যাক।

ওরই নাম ডেভিড ওরফে কর্তার সিং।

ডেভিডের এ মুহূর্তে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তার একটা কারণ যদিও দেওয়ালীর পর ফুরকিয়ার এই বিকট চড়াই, তাহলেও তার বেশি ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছে পিঠের রুকস্যাকটা। ফুলে-ফেঁপে ওটা এখন কিম্ভূতকিমাকার। এর ভেতর

ঢুকেছে ওর নিজের মাল, এই অভিযানের অনেক সাজ-সরঞ্জাম তার ওপর গুলসনের কিছু জিনিস। কারণ গুলসন এখন অসুস্থ। মেজাজটা তাই বেশ খিচঁড়ে আছে।

শেরপা ছেলেটি হাঁটছে ওর পেছন-পেছন। ওর নাম জিংমো। ফরসা শক্ত সমর্থ চেহারা। আকৃতিতে ডেভিডের কাছে ওকে খুব ছোটো মনে হলেও ওর পিঠের ভার ডেভিডের ভারের প্রায় দ্বিগুণ। বিরাট রুকস্যাক ছাড়াও ওর পিঠে ঝুলছে লম্বা একটা হ্যাভারস্যাক। তার ভেতর আছে বরফ খোঁড়ার নানারকমের যন্ত্রপাতি। গুলসনের কিছু মাল ওর ওপরও চেপেছে। তবে তাতে ওর কোন বিকার নেই। ছোট ছোট পা গুলো যতটা পারা যায় লম্বায় ফেলে ডেভিডের সমান তালেই সে চলছে।

দোয়ালীর পর রাস্তার মাঝে-মাঝে তুষারাবৃত ঢাল। এই ঢাল গুলো খুব সাবধানে পেরোতে হচ্ছে ডেভিডকে। পা পিছলে গেলে একেবারে বাঁ পাশের খাদে। ওই খাদ দিয়েই বইছে পিণ্ডারী নদী। তবে এরকম ঢাল এলে জিংমোই আগে পেরোয় জায়গাটা। বরফে ওর কোনো অসুবিধে হয়না। টুকটুক করে পেরিয়ে যায়। দোয়ালীর পর এরকম দুটো ঢাল পেরিয়ে তৃতীয়টা আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল ডেভিড। পেছন ফিরে তাকাল। যা ভেবেছিল তাই। রাজ আর গুলসনের কোনো পাত্তা নেই। জিংমোকে ইশারা করে ডানদিকের উঁচু মাটির ওপর ভারী রুকস্যাকটা নামাল সে। এই বরফ পেরোনোর আগে আবার ওদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এর আগের দুটোতেও করতে হয়েছিল। মেজাজটা ওর আরো খিটখিটে হয়ে গেল। ঢাকুরী থেকে এই অব্দি এরকম কত জায়গায় যে দাঁড়াতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তা না হলে এতোক্ষণে ফুরকিয়ায় গিয়ে ঘন্টাখানেকের বেশী বিশ্রাম হয়ে যেত।

—শার্দুল একদম পারছে না। জিংমো ওর পিঠের দুটো মাল নামিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলল, ওকে নিয়ে এসে আপনারা খুব ভুল করেছেন।

শার্দুল হল গুলসনের পোশাকী নাম। জিংমো ওদের এই নাম ও এই রূপেই চেনে। এর উত্তরে ডেভিড কিছু বলল না। কি বলবে? কথাটা যে পুরোপুরি সত্যি। গুলসন এ পথে একেবারে অচল। দিল্লী থেকে ভারারি সবই ঠিক ছিল। গোলমাল বাঁধল ওর হাঁটার পর থেকে। বিশেষ করে লোহারক্ষেতের পর যা খেল্ দেখাল, ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায় ডেভিডের।

ওফ্ এর মধ্যে কম ঝক্কি পোয়াতে হয়েছে ওকে নিয়ে। প্রথমে মাথা ব্যথা তারপর বমি শেষ পর্যন্ত ঢাকুরীর কাছে এসে রুকস্যাক নিয়ে একেবারে রাস্তায় পড়ল হুমড়ি খেয়ে। ওর জিনিস-পত্র তারপরেই ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তাও কি তামাশার শেষ হয়। ধুঁকতে ধুঁকতে যখন ঢাকুরী পৌঁছল তখন কিনা বলে আর এগোবে না। দিল্লী ফিরে যাবে।

অনেক কষ্টে তখন নিজেকে সামলেছে ডেভিড। ইচ্ছে করছিল ডান হাতের চেটোয় ওর গালে একটা থাবড়া বসিয়ে দিতে। বাপধন ভেবেছে বেড়াতে এসেছে এখানে। ইয়ার্কি! এরকম একটা মারাত্মক কাজে নেমে মাঝ পথে ওরা ওকে ছেড়ে দেবে! তারপর কোথাও কিছু ঝামেলা পাকলে? সব মিলে ফেঁসে যাক, আর কি! খবরদার ওকথা আর একদম মুখে নয়। শাসিয়ে ধাক্কা মেরে তারপর ঢাকুরী বাংলো থেকে আজ ওকে বের করতে হয়েছে। ঘসটে ঘসটে খাতি পর্যন্ত এল চাঁদু, তারপর জানা গেল আরেক কেলোর কথা। গুলসনের ছোট চামড়ার ব্যাগটা ভানু সিং নাকি ঢাকুরীর চুড়োয় ফেলে এসেছে। যার মধ্যে মেয়েটার বাড়তি ছবিখানা আছে। শুনে মাথায় আগুন জ্বলে গেল ডেভিডের। তাজ্জব, এইটুকু ব্যাগ তাও ভানু সিং-এর পিঠে চাপিয়েছিল গুলসন! রাগের চোটে তখন গুলসনের গলাটাই সে জাপটে ধরেছিল। রাজ এসে ছাড়াল বলে, তা না হলে তখনই ওর দফারফা হত। ভানু সিং অবশ্য হুমকি খেয়ে ছুটেছে ব্যাগটা আনতে। কিন্তু পাওয়া যাবে কি? ···যদি না পাওয়া যায়?

না! এখন আর ভাবতে পারছে না। ভাবলেই মাথায় রক্ত ছুটে আসে। কাজে নেমে বেয়াদপি একদম সহ্য করতে পাররে না ডেভিড। এই সময় এ ধরনের ভুল-চুক অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ব্যাগটা ওদের পেতেই হবে। এই ভুলের জন্য গুলসনের শাস্তির কথা পরে দিল্লীতে গিয়ে ভাবা যাবে।

ডেভিড আবার তাকাল পেছন দিকে। এখনো ওদের পাত্তা নেই। কোথায় গেল? এই তো ঘণ্টা খানেক আগে একটা বরফের এলাকা জিংমো ধরে ধরে পার করাল ওকে। এইটুকু পথে আবার পেছিঁয়ে গেছে! রাজ নিজেও বোধহয় হাঁটতে পারছে না, ওকে আর সামলাবে কি। ওরই ওপর দায়িত্ব এখন গুলসনকে টেনেহিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। হতভাগাটাকে যেভাবে হোক নন্দাখাত বেস ক্যাম্প অব্দি নিয়ে যেতেই হবে।

কারো টিকি না দেখে শেষ পর্যন্ত একটা সিগারেট ধরাল ডেভিড। উপায় নেই। অপেক্ষা করতেই হবে। জিংমোর সাহায্য না পেলে গুলসন এই সামনের বরফের বাধা পেরোতে পারবে না।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সামনের তিনটে তুষার-শৃঙ্গের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

ডেভিডরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার প্রায় দশ গজ পেছনে রাজ তখন গুলসনকে ধরে ধরে এগিয়ে নিয়ে আসছে। ওদের দুজনেরও ডেভিডের মত সেই এক বেশ। মাথায় পাগড়ী মুখে চাপ দাড়ি।

গুলসন এ মুহূর্তে একটা চড়াই কিছুতেই উঠতে পারছে না। ওর কোমর ধরে সামলে আছে রাজ। মাঝে মাঝে টানছে শক্তি দিয়ে। বিশ্রী কষ্টকর কাজ। নিজেই পারছে না তার ওপর এই বোঁচকা। কিন্তু উপায় নেই। ডেভিডের হুকুম গুলসনকে এভাবেই নিয়ে যেতে হবে।

গুলসনের চোখ-মুখ ভয় ও অবসাদে প্রায় কোটরাগত। ভয়ঙ্কর মানসিক চাপে শরীরও শক্ত কাঠ। পা কিছুতেই চলতে চাইছে না। তবু রাজের খেচানোর চোটে কোনমতে একটু একটু করে এগোচ্ছে। তারপর চড়াইটা বহুকষ্টে সম্পুর্ণ করে ধপ করে বসে পড়ল সে মাটিতে।

—কি হল বে! রাজ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাকাল।

—দাঁড়া। জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে বলল গুলসন। একটু জিরিয়ে না নিলে আর পারব না।

—একটু একটু করে অনেক হল সোনা। ওঠো ঝটপট। না হলে, ওস্তাদ ওদিকে জান কয়লা করে দেবে।

কিন্তু গুলসনের তখনই ওঠার কোনো ক্ষমতা নেই। মাথা ব্যথা আর চরম ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিল সে রাস্তার পাশে। ওর চেহারা দেখে রাজ নিরুপায় হয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটা পাথরের ওপর ভারী রুকস্যাকটা নামাল। তারপর নিজেও বসল তার ওপর। অনেকক্ষণ থেকে ডান পায়ের জুতোয় আঙ্গুলে কি যেন লাগছে। এই ফাঁকে দেখে নেওয়া যাক। ঝুঁকে ফিতেটা খুলতে শুরু করল সে।

ওদিকে গুলসন শুয়ে আছে মাটির ওপর। অবসাদ ছাড়াও নানা ভয়ার্ত

চিন্তা ওকে একেবারে কাহিল করে দিয়েছে। দুঃস্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর সব আশঙ্কা ভীড় করেছে মাথায়। চোখ বুঝলেই দেখছে কালো কালো অদ্ভুত সব ছায়া। পা যেমন চলতে চাইছে না তেমনি অজানা ভয়ে মগজটাও হয়ে গেছে পঙ্গু। খাদ দেখলেই আঁতকে উঠছে বুক। পাহাড় মোটেই সহ্য হচ্ছে না। এই দুর্গম চড়াই, জঙ্গল, খাড়াই বিশাল বিশাল পাথর, নির্জনতা সব মনে হচ্ছে মৃত্যু ফাঁদ। পাহাড়ী পরিবেশ যে ওর কাছে এত ভয়াবহ হবে, তা বিন্দুমাত্র জানলে এ পথ ও মাড়াত না। পঁচিশ হাজার কেন একলাখ পেলেও না। কিন্তু দিল্লীতে এই সব এলাকার ছবির পর ছবি দেখেও সে আঁচ করতে পারেনি বাস্তাব ছবি হবে অন্যরকম। আসলে সব গোলমাল হয়ে গেল ডেভিডের ওপর ভরসা করে। কারণ গুলসন চিরকালই ডেভিডের সাকরেদ। বলতে গেলে ওর অন্ধ ভক্ত। আর সেটাই হল ওর এখনকার দুর্দশার কারণ। শুধু তাই নয় এই ভয়ঙ্কর পথে ডেভিড স্বয়ং এখন ওর কাছে সাক্ষাৎ এক মৃত্যু-মূর্তি। আজ সকালের কথাটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠল গুলসন। ওর, কালো ব্যাগটা ভানুসিং ঢাকুরীর মন্দিরে ফেলে এসেছে কথাটা জানামাত্র কি নৃশংস ভাবে ডেভিড ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঠিক যেমন হুলো-বিড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে মুরগীর টুঁটি টিপতে। অথচ ডেভিড কিছুতেই বুঝতে পারছে না এই ভয়াবহ পাহাড়ে এসে গুলসনের শরীর মন দুটোরই কি কাহিল অবস্থা। জোর-জবরদস্তি করে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায়? কিন্তু ডেভিড তাই করাবে। ওকে টানতে টানতে সে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। গুলসনের এখন সাপে ছুঁচো গেলার মত হাল। না পেছোতে পারছে না এগোতে। ডেভিডের নির্দেশ অমান্য করে ফেরত চলে যাবে এমন হিম্মত ওর নেই। ডেভিডকে সে হাড়ে-হাড়ে চেনে। দয়া-মায়া বলে কোনো বস্তু তো ওর মধ্যে নেই-ই বরং কাজে নেমে ও যতটা নৃশংস নিষ্ঠুর হয়ে যায় তা সাক্ষাৎ যমদূতকেও বোধহয় হার মানায়। গুলসন অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সামনের উঁচু পথের দিকে।

ঠিক তখনি রাজ চেঁচিয়ে উঠল—ওই ভানুসিং বেটা—আসছে।

নামটা শোনা মাত্র উঠে বসল গুলসন। ভানুসিংয়ের চিন্তা অনেকক্ষণ ধরেই ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ব্যাগটা কি পেয়েছে? গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল গুলসন। ভানুসিং সামনের উতরাইয়ে নেমে উঠছে এখন। কিন্তু ব্যাগটা ওর কাছে আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। ওর পিঠে একগাদা মাল-পত্র।

কয়েক মুহূর্ত অস্থির হয়ে রইল মন। ব্যাগটা যদি শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায় তাহলে ডেভিডের কপালে আরো দুর্ভোগ আছে। ভানুসিং চড়াইটা প্রায় শেষ করল।

—ভানুসিং! গুলসনের উদগ্রীব কণ্ঠ।

ভানুসিং হাঁপাচ্ছে। এইটুকু সময়ে ঢাকুরী খাতি দুবার করে তারপর খাতি থেকে এত মাল পত্তর। কম ঝক্কি। একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, বাবু রুকস্যাক খুলে নিয়ে নিন থলেটা। ওপরেই আছে।

শক্ত-দেহটা শিথিল করল গুলসন। যাক ধড়ে প্রাণ এল এতক্ষণে। কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে ভানুসিংয়ের রুকস্যাকটা খুলে বের করল ওর কালো ব্যাগ। চোখ-মুখ চকচক করে সঙ্গে-সঙ্গে আর কথা নয়, চেন খুলে ভেতরে হাত ঢোকাল। ছোট্ট ব্যাগ, বেশি হাতড়ানোর জায়গা নেই। কিন্তু কই খামের নত কিছু তো ঠেকল না। বুকটা একবার কেঁপে উঠল গুলসনের। আবার নেড়ে-চেড়ে ভাল করে দেখল। নাঃ সবই আছে শুধু ছবিটাই ভেতরে কোথাও নেই।

—কি হল বাবু? ভানুসিং ওর সিটিয়ে যাওয়া মুখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজও তখন ওদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে—বেঁচে গেলে বাপধন। ব্যাগটা তাহলে পাওয়া গেল। মাল কড়ি সব ঠিক আছে বে?

গুলসন আড়চোখে দেখল। রাজ খানিকটা দূরে ওর জুতো বাঁধতে ব্যস্ত। এখন ও ব্যাগ ছাড়া আর কিছু বোধহয় লক্ষ্য করেনি। মোদ্দা কথা ছবিটা নেই ব্যাগের ভেতর। একবার মুহূর্তের জন্য ডেভিডের কঠিন বীভৎস মুখটা ভেসে উঠল ওর চোখে। তারপরেই সব ঠিক করে নিল গুলসন। ব্যাগের চেনটা সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ করে কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। চল্। তারপর ঘুরে ভানুসিংকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ভানুসিং ব্যাগটা কোথায় পেলে?

ভানুসিং-এরও আগেই সব স্থির করা ছিল। এরা যেমন খিটপিটে লোক, থলিটা যে অন্য হাত ঘুরে এসেছে সে কথা আর এদের সে বলবে না। বললে কি প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে। এমনিতেই বলেছে থলি না পেলে টাকা-পয়সা এক কানা-কড়িও দেবে না ওকে। তাই ও গুলসনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, ওটা মন্দিরেই পড়ে ছিল বাবু।

—আশে-পাশের পাথর সব ভাল করে দেখেছো। আর কিছু ছিল কিনা সেখানে?

—হ্যাঁ বাবু। ওখানে আর কিছু নেই।

—ঠিক আছে চলো। গুলসন ধীর পায়ে চলতে শুরু করল। রাজের তখন রুকস্যাক পিঠে চড়ানো হয়ে গেছে। ওরা এক সাথে সামনের ঢালে নামতে লাগল।

গুলসনের মাথায় কিন্তু তখন ঝড় বইতে শুরু করেছে। ব্যাগের ভেতর থেকে ছবির খামটা গেল কোথায়? চেন খুলে আপনা-আপনি ওটা সটকে পড়তে পারে না। কেউ নিশ্চয়ই হাতিয়েছে। কিন্তু কে? ভানুসিং কি? না তা হবে না ওটা নিয়ে ওর লাভ? ওর কেন, কারুরই কোন লাভ নেই এই ছবি নিয়ে। তাহলে কি করে হাপিশ হল! গুলসনের অবসন্ন ক্লান্ত মগজ এ নিয়ে আর বেশী ভাবতে পারল না। ডেভিডের কথা ভেবেই শুধু ওর ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ভয়ে এত সিটিয়ে গেল যে সামনের একটা চড়াই পেরোতে রাজের সঙ্গে ভানুসিংকেও হাত লাগাতে হল ওর পিঠে। ছবির চিন্তা আর ভয়ঙ্কর পাহাড়ী পরিবেশ ওকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। দুজন দুদিক থেকে ধরে ওকে পার করাল চড়াইটা।

এই চড়াইয়ের ওপারেই তলায় দাঁড়িয়েছিল ডেভিড আর জিংমো। ডেভিড রক্ত চোখে একবার দেখল গুলসনের হাল-চাল। দাঁত কড়-মড় করে উঠল ওর। নিজেকে সামলে ওরা কাছে আসতে কর্কশ স্বরে বলল—এইটুকু রাস্তা পেরোতে দিন কাবার করে দিলি!

—কি করব? রাজ কাঁধ ঝাঁকাল—শার্দুলের হালাত দেখো একবার। মুরগী হালাল হলেও এমন চুপসোয় না।

গুলসনের দিকে তাকিয়ে একটা বিশ্রী গালাগাল দিল ডেভিড। তারপর মুখ বিকৃত করে বলল, তোকে শেষ দম পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, বুঝলি ব শুয়ার! ব্যাগের মাল-পত্তর ঠিক আছে?

গুলসন নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে মাথা হেলাল—হ্যাঁ ঠিক আছে।

—খামটা দে আমাকে?

গুলসনের নিশ্বাস মুহূর্তের জন্য হোঁচট খেল যেন। তারপর মরীয়া হয়েই

চোস্ত গলায় বলল, তোর কাছে তুটো রাখবি কেন। ওটা আমি উইণ্ডচীটারের ভেতরের পকেটে সামলে রেখে দিয়েছি।

—চুপ কর !!—! সামলে রেখেছিস! ডেভিড দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল—ওই খাম না পেলে তোর জান এখনই খতম করে দিতাম। দে ওটা গুরমীতকে। ওর কাছেই থাকবে খামটা।

গুরমীত হল রাজের নাম। গুলসন তাকাল ওর দিকে। ভয়ার্ত ওর দৃষ্টি, কি যে করবে বুঝতে পারছে না। ঠিক তখন রাজই বাঁচাল ওকে। পিঠে বিশাল রুক স্যাকের ভার নিয়ে সে ডেভিডের দিকে ঘুরে বলল, এখন ছেড়ে দে ওস্তাদ। আবার আমি বোঁচকা নামাব। ফুরকিয়াতে গিয়ে দেখা যাবে।

ডেভিড এবার কিছু বলল না। গম্ভীর মেজাজে রুক স্যাকটা পিঠে চড়িয়ে জিংমোর দিকে তাকিয়ে বললো, চলো!

জিংমো একটু আগেই সামনের বরফের বিশাল রাস্তাটা পেরিয়ে ওর মালপত্র গুলো ওপাশে রেখে এসেছে। যাতে গুলসনকে ধরে এটা পার করাতে পারে। গুলসনের দিকে তাকাল সে।

গুলসনও দেখল সামনের তুষারে ঢাকা বাঁকানো পথটাকে। পিণ্ডারির খাদ ঘেঁষে পিচ্ছিল রাস্তা। ওর কাছে ভয়ঙ্কর এক মৃত্যু-ফাঁদ যেন। এর আগের তুটো পার হতে গিয়েই পিলে চমকে উঠেছে ওর। যদিও তখনও ওকে জিংমোই ধরে ছিল। যদিও এটা ওগুলোর চেয়ে আরো বিপজ্জনক আরো পিচ্ছিল। তবুও ছবির খাম হারিয়ে যাওয়াটা ওর কাছে এত মারাত্মক যে আপাতত সামনের এই মৃত্যু-ফাঁদও সেই ভয়ের কাছে ফিকে হয়ে গেল। তখন ফুরকিয়াতে গিয়ে কি হবে সে কথা ভাবতে ভাবতেই জিংমোর দিকে এগিয়ে গেল সে।

তবে ফুরকিয়াতে গিয়ে সে রাতে আর ছবি নিয়ে কিছু হল না। কারণ ওখানে পৌঁছে ডেভিড একটু অসুস্থ হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়! ওর প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার একটা রোগ আছে, সেই মাথা ব্যথাটাই হঠাৎ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছটফট করতে হয়েছে একটু রাত পর্যন্ত। আর ওর এই কষ্টটাই সেদিনকার মত গুলসনকে বাঁচিয়ে দিল।

আগের দিন রাতেই বাড়ির জন্য চিঠি লিখে রেখেছিল সৌরভরা। খাতিতে

একটা পোষ্টাপিস আছে। এখান থেকে মেল-রানার চিঠি নিয়ে যায় ভারারি পর্যন্ত। সকালে উঠে হালুয়া-চিঁড়ে ভাজা দিয়ে জলখাবার খাওয়ার সময় বীরসিং চিঠি গুলো ডাকে দিয়ে এল। খাতি এই এলাকার শেষ গ্রাম। এখানে পঁচিশ-তিরিশটা বাড়ি আছে। আর আছে একটা প্রাইমারী স্কুল ও একটা দোকান। এই দোকানে চাল-চিনি থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের জুতো পর্যন্ত পাওয়া যায়। কাল গ্রামটা ঘুরে দেখেছে ওরা। খাতি আসলে এই এলাকার অন্যান্য দূরবর্তী গ্রামগুলোর মধ্যে প্রধান যোগাযোগের কেন্দ্র। খাতি বাংলোর লাগোয়া একটা প্রাইভেট ক্ষুদ্র রেস্তোরাঁ আছে যেখানে চা-ওমলেট পাওয়া যায়। প্রয়োজনে রেস্তোরাঁর পাশের ঘরটাও টুরিষ্টদের ভাড়া দেওয়া হয়।

এই রেস্তোরাঁ থেকে চা খেয়েই ওরা সেদিনের যাত্রা শুরু করল। সকাল তখন সাড়ে ছটা। সামনে কিছু দূরে তুষার শৃঙ্গের গা বেয়ে সাদা রোদ গড়িয়ে পড়ছে। ওদের পথ সেদিকেই। প্রথমে কিছুটা চড়াই। তারপর আবার সুন্দর নেমে যাওয়া। পিণ্ডারি নদী এখান থেকেই সঙ্গ নিল ওদের। যদিও সে বয়ে যাচ্ছে উলটো দিকে। তবু ছোটো-বড় উজ্জ্বল শীলাখণ্ডের ওপর দিয়ে তার জলোচ্ছ্বাস পথিকের মনে আনন্দ যোগায়। তার তালে তাল রেখে হাঁটতে ভাল লাগে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা হঠাৎ খেয়াল করল সামনের সেই তুষার শৃঙ্গ আর নেই। পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে পিণ্ডারি নদী পেরোনোর আগে আবার তার দেখা মিলল।

পিণ্ডারি পেরিয়ে একটু চড়াই। আরো পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে তারপর সামনে দোয়ালী বাংলোর সুন্দর ছবি। ওই বাংলোর নীচেই পিণ্ডারির সঙ্গে এসে মিশেছে কাফনী নদী। পিণ্ডারির বিশাল পাথরের চর ও পর পর দুটো নদীর সাঁকো পেরিয়ে খাড়া উঠতে হল ওদের। তারপর বাংলোটা ঠিক যেন একটা উঁচু ব্যালকনির ওপর। সামনের সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যই বোধহয় ওটা তৈরী করা করা হয়েছে এখানে।

বীর সিং ওদের কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসে পৌছেছে। মৃণালের নির্দেশে খাতিতে সকালেই সে এখানকার লাঞ্চের জন্য বানিয়েছিল রুটি আর তরকারী। লনের চেয়ারে বসে সামনের দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই খাবার ওরা খেতে শুরু করল।

বাঁ দিকে কাফনী নদী। তার ধার ধার দিয়ে গেছে কাফনী গ্লেসিয়ার যাওয়ার পথ। নীচে ডানদিকে বয়ে যাচ্ছে পিণ্ডারি নদী। তার দুপারে গোল-গোল ছোট বড় পাথরের সমারোহ। কাঠের দুটো সেতুকে এখান থেকে ঠিক মনে হচ্ছে খেলনার মত। তাছাড়া চারপাশে সবুজের ছড়াছড়ি। ঠিক তেমনি পেছনে পাহাড়ের সারির ওপারে উঁকি মারছে ধপধপে তুষার শৃঙ্গ। পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘেরা এক অপূর্ব জায়গা এই দোয়ালী।

সৌরভরা যখন দোয়ালী বাংলোয় বসে লাঞ্চ খাচ্ছে তার ঘণ্টা খানেক আগে দিল্লী এয়ার পোর্টে প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের একটি প্লেন থেকে নামল এক তরুণ বিদেশী যাত্রী। মাঝারী স্বাস্থ্য ছেলেটির। চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ। পরণে জেট-ব্ল্যাক পলিয়েস্টারের স্যুট টাই মাথায় ফেল্ট-হ্যাট ও হাতে একখানা জমকালো ব্রীফকেস। প্লেন থেকে নেমে সোজা কাষ্টমস্-কাউন্টারের দিকে গটগট করে সে এগিয়ে গেল।

দিল্লীতে ঢোকার সবকটা বাধা পেরোতে ওর আধঘণ্টা মাত্র সময় লাগল। বড় তাড়া তার। তাই সব জায়গায় সারির প্রথমে সে আগ বাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

এয়ার পোর্ট লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি। তারপর সিধে পামেরোর হোটেল। পামেরোর কাছে ঘটনাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। সে দরজা খুলে আকাশ থেকে পড়ল যেন—কি ব্যাপার লোমী, তুমি এখানে!

লোমী ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজিয়ে বলল—ব্যাপার খুব গুরুতর। তোমাকে তাই এত্তালা না দিয়েই চলে আসতে হল।

—একটা তার করতে কি সময় লাগত খুব? পামেরোর বিস্ময় ভাবটা তখনো কাটেনি। কোচগুলোর দিকে পা বাড়িয়ে বলল, এলে তো কয়েক ঘণ্টা ধরে। তার অনেক আগে তারটা পেয়ে যেতাম।

—তার দিয়ে অহেতুক ঝুঁকি নিলাম না বস্। লোমী ব্রীফকেসটা সোফার এক পাশে রেখে ধপ করে তার ওপর বসে বলল—সঙ্কেতে হলেও বলা যায় না তার সূত্র ধরে রজারের দল চলে আসতে পারে এখানে।

—যাক্, কি খবর বল। পামেরো কোচে বসল।

—খবর গোলমেলে। রজার আমেরিকায় তোমার অনুপস্থিতি আঁচ

পেয়েছে। হন্যে হয়ে তার লোক খুঁজছে তোমাকে। তবে ঠিক কোথায় আছ এখনও বুঝতে পারেনি। সেটা জানার আগেই তোমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আপাতত আমি তোমার জায়গায় এখানে থাকব।

কথাটা শুনে বিচলিত হল পামেরো। স্বগতোক্তির স্বরে বলল, আমি জানতাম। গত সাতদিন ধরে আমি এখানে নেই, টের ও পাবেই। তাহলে আর কোনো কথা নয় আমাকে ফিরে যেতেই হবে। আমি যে আমেরিকা ছাড়িনি সেটা ওকে জানানো দরকার।

—এদিকের খবর কি? লোমী পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, কাজ কতদূর?

পামেরো ওর চিন্তিত দৃষ্টি শূন্য থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, এই সোমবার ওরা দুর্ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

—এই সোমবার! লোমী একটু চমকে উঠল, তাহলে ফিরবে কবে?

—তা খুব তাড়াতাড়ি হলেও বারো-তেরো তারিখের আগে নয়।

—হয়েছে! লোমী আরো আঁৎকে উঠল, তাহলে আটই জুন ওরা কোথায় থাকবে, দুর্ঘটনাস্থলেই?

পামেরো সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ আটই জুন ওদের ওখানেই থাকার কথা। কেন?

—আমার ছুটে আসার ওটাও একটা কারণ। লোমী উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, আমরা খবর পেয়েছি সেদিন আমাদের সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার নন্দাখাত পাহাড়ের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে। ওই হেলিকপ্টারে থাকবে একজন ভারতীয় মাউন্টেনীয়ার। তার রিপোর্ট পাওয়ার পর রেসকিউ টিম আসবে এখানে।

—আটই জুন! পামেরো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল লোমীর দিকে। কি বলছ তুমি, পাকা খবর?

—হ্যাঁ খবরটা এলপাইন ক্লাবের একজন কর্মী আমাদের জানিয়েছে। সে আমাদের লোক।

—কিন্তু···আমি জানতাম আটই জুন পুরো রেসকিউ টিমেরই দিল্লী আসার কথা।

—ওটা আপাতত মুলতুবি হয়েছে।

পামেরো আর কোনো কথা না বলে চটপট উঠে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে নম্বর চাইল একটা। তারপর মিনিট দশেক ধরে কার সঙ্গে স্বর পরিবর্তন করে খুবই ভদ্রভাবে কথা বলে ফিরে এল আবার। মুখটা তখন আরো থমথমে ওর আরো চিন্তিত।

—হ্যাঁ খবর তোমার ঠিক। লোমীর দিকে তাকিয়ে চিন্তান্বিত স্বরে সে বলল, ওহিও এলপাইন ক্লাবের স্থানীয় ট্র্যাভেলিং এজেন্টও তাই বলল।

—শুধু তাই নয়, লোমী মুখ তুলে বলল, এর মধ্যে আরো যা খবর যোগাড় হয়েছে তাতে জানা গেছে রজার এই রেসকিউ টিমকে আরো জোরদার করার জন্য বেশ উঠে পড়ে লেগেছে। সে হঠাৎ খুব পাহাড় দরদী হয়ে এই ক্লাবকে প্রচুর টাকা দিয়েছে নাকি যাতে লাশ উদ্ধারে কোনো ত্রুটি না হয়।

—তা ও দেবেই। পামেরো দাঁত কড়মড় করে বলল, মেয়েটার গলার হার ওর যে চাই-ই। কিন্তু লোমী আটই জুনের ব্যাপারে তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ আপাতত এটাই আমাদের কাছে মারাত্মক। দাঁড়াও আরেকটা ফোন করি।

পামেরো যে বেশ ঘাবড়ে গেছে ওর হাব-ভাব দেখেই বোঝা গেল। এবার রিসিভার তুলে প্রেমনাথের আস্তানার নাম্বারটা চাইল। কয়েক সেকেণ্ডেই ভেসে এল আওয়াজ। তবে অন্য গলা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে বলল—না সায়েব এখন বাড়ি নেই। আপনি কে বলছেন?

পামেরো নিজের ছদ্মনামটা বলল, বল হ্যারিম্যান ওকে ডেকেছে এক্ষুনি। ঠিক আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ এলেই বলব।

রিসিভার নামিয়ে চিন্তিত পদক্ষেপে পামেরো আবার এলো লোমীর কাছে। লোমী জিজ্ঞেস করল—এটা আবার কাকে ফোন করলে।

পামেরো ভাবতে ভাবতে বলল, আসল লোককে। যার ওপর ভার পরেছে ওই হারটা উদ্ধার করে আনার। তারপর এখানে এ ক'দিনে যা ঘটেছে তার একটা মোটামুটি সে ফিরিস্তি দিল লোমীকে। সব শেষে বলল, তাহলে বুঝতে পারছ, ছেলেগুলো এমন জায়গায় আছে যেখানে ত্রীসীমানায় যোগাযোগ করার কোনো উপায় নেই। অথচ ওরা আটই জুন ওই দুর্ঘটনাস্থলে পুরোপুরি কাজের মধ্যেই থাকবে। তখন সেই দুর্ঘটনারই তদন্তকারী হেলিকপ্টার যদি উড়তে উড়তে সেখানে যায় কাণ্ডটা কি সাংঘাতিক হবে বলো দেখি।

—সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে রজার যদি জানতে পেরে যায় এসব কথা। তখন ওই হার কিছুতেই আমরা উদ্ধার করতে পারব না। লোমীও চিন্তা প্রকাশ করল। —তাহলে কি করবে এখন?

তখনই ফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে। পামেরো এগিয়ে তুলল রিসিভার। প্রেমনাথের গলা—কি ব্যাপার মিঃ পামেরো, আপনি আমায় তলব করেছেন?

—হ্যাঁ। পামেরো খসখসে স্বরে বলল, তোমাকে এক্ষুনি আসতে হবে এখানে। দেরী কর না, যত তাড়াতাড়ি পার?

—এক্ষুনি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই মুহূর্তে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

—আসছি। কিন্তু আমি ফরিদাবাদ থেকে বলছি সায়েব। পৌঁছতে একটু সময় লাগবে।

—কতক্ষণ?

—খুব তাড়াতাড়ি হলেও ঘণ্টা দুয়েক তো বটেই।

পামেরো ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর কি ভেবে বলল, ঠিক আছে চলে এস।

—যে আজ্ঞে। রিসিভার রেখে দিল ওপারে।

—লোমী। পামেরো হনহন করে ওর কাছে এসে বলল, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর। আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ফিরে এলেই জানতে পারবে সব। পামেরো ভেতরের ঘরে গিয়ে চশমা পরে বেরিয়ে এসে আবার বলল, এর মধ্যে একজন শুধু আসতে পারে। মাঝ-বয়েসী। মুখটা হোঁতকা। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। নাম প্রেম। ওকে এখানে বসিয়ে রাখবে। অবিশ্যি আমি তার আগেও চলে আসতে পারি।

প্রচণ্ড ব্যস্ততা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পামেরো।

দোয়ালীতে আটঘণ্টা থেকে আবার সৌরভরা হাঁটা শুরু করেছিল। দোয়ালীর পর পুরোটা চড়াই। কিন্তু কিছুদূর এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সব। পথে এত তাড়াতাড়ি যে বরফ দেখা যাবে কেউ ভাবতে পারেনি। ওরা দেখল

বিশাল তুষারের ঢাল নেমে এসেছে ডান দিকের পাহাড় থেকে। রাস্তা ছাপিয়ে সেই তুষার নেমে গেছে বাঁ দিকে পিণ্ডারি নদীর ওপর। অর্থাৎ এই বরফ পেরিয়ে ওদের যেতে হবে এখন। খুব আনন্দ। তবে সাবধানে পেরোতে হল এই তুষার সেতু। রাস্তা তো সমান নয়। পিছলে গেলে একেবারে গড়িয়ে পড়তে হবে তলায় পিণ্ডারি নদীতে।

আরো ছ-সাতটা এরকম ঢাল পেরিয়ে ওরা যখন ফুরকিয়া পৌঁছল তখন তিনটে বেজে গেছে। ফুরকিয়া বাংলোর ঠিক পেছনেই তুষারশৃঙ্গ। সামনেও তাই। আর পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারের রাস্তাটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে তিনটে বিশাল শৃঙ্গ। বালজোরী, পাওনাছুয়ারী ও নন্দাখাত। আপাদমস্তক বরফে ঢাকা। এই তিনটে শৃঙ্গের টানে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে আসছে ওরা। দোয়ালীর একটু পর থেকেই এরা সব সময় ওদের সামনে ছিল।

কিন্তু বাংলোর চত্বরে দাঁড়িয়ে যে ওদের প্রথম স্বাগত জানাল তাকে দেখে সবাই অবাক। লোকটা যে ভানু সিং দূর থেকে কেউ-ই বুঝতে পারেনি। কাছে যেতেই মিটি-মিটি হাসি নিয়ে সে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

সৌরভরা যখন ফুরকিয়ায় পৌঁছল ডাক্তার জয়ন্ত বোস তখন ভারারি থেকে হাঁটতে হাঁটতে লোহারক্ষেতের কাছাকাছি। তিনি যথারীতি তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনেই বেরিয়ে পড়েছিলেন কলকাতা থেকে। এ মুহূর্তে তার সঙ্গী তিনজন। কম্পাউণ্ডার সমীরণ রায় ও দুটি কুলি। সমীরণ যুবক। ছিপছিপে ফরসা চেহারা। স্বাস্থ্য ভালই। শার্ট-প্যান্টের ওপর পিঠে একটা হ্যাভার স্যাক নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হাঁটছে। কুলিদের একজনের পিঠে বস্তায় ওষুধপত্র ও ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম। আরেকজন বইছে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব জিনিষপত্র। একমাত্র ডাক্তারবাবুর পিঠে কিছু নেই। তিনি হাতে একটা লাঠি নিয়ে টুকটুক করে হেঁটে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ী ছোটো নদীর সাঁকোটা পেরিয়ে সমীরণ প্রথম লোহারক্ষেতে প্রবেশ করল। দু একজন গ্রামবাসী হাত জোড় করে স্বাগত জানাল ওদের। এরা সবাই ডাক্তার বাবুর গত বছরের রুগী। বাংলোয় পৌঁছেও দেখা হল এরকম আরো কয়েকজনের সঙ্গে। সবাই ডাক্তার বাবুর

অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে। বাংলোর চৌকিদার ছুটে এল ডাক্তার বাবুকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ডাক্তার বাবু যে আজ এখানে আসবেন সেটা মোটামুটি সব গ্রামবাসী জানে। ডাক্তারবাবুই চিঠিতে জানিয়ে দেন স্থানীয় মন্দিরের পুরোহিতকে। তার মারফৎ আর সবাই জানতে পারে। ডাক্তারবাবু সন্ধ্যের সময় আজ ঘণ্টা দুয়েক ওষুধ-পত্র নিয়ে বসবেন এখানে। এই বাংলোর বারান্দাতেই হবে তাঁর অস্থায়ী ডাক্তারখানা। চৌকিদারই সব ব্যবস্থা করে দেবে। বাইরের ভিড় তখন বাড়বে একটু। তবে লোক তো বেশী নেই লোহারক্ষেতে। তারপর ভারারির হাসপাতালও এখান থেকে বেশী দূরে নয়। তাই ভিড় যতই হোক তিরিশ জনের বেশী হবে না। বেশী ভিড় হয় খাতিতে।

চৌকিদার ডাক্তারবাবুকে বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে ছুটে গেল বাইরের লোকদের আপাতত একটু হটিয়ে দিতে। ডাক্তারবাবু এখন চা-টা খাবেন। বিশ্রাম করবেন তারপর দেখবেন ওদের।

দিল্লী।

দুপুর তিনটে নাগাদ পামেরোর ঘরে মোট তিনজন বসে। কোচ দুটোয় লোমী আর প্রেমনাথ। সোফায় পামেরো। লোমীর সঙ্গে প্রেমনাথের পরিচয়পর্ব শেষ হয়ে গেছে। তবে বেশী কিছু বলেনি পামেরো ওকে। শুধু বলেছে একটা জরুরী কাজে ওকে এখুনি আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। ওর পরিবর্তে লোমী এখন দিল্লীতে থাকবে। হার উদ্ধারের সব দেখাশোনা ও এর জন্য যা প্রয়োজন সব এবার থেকে লোমী করবে। কিন্তু তারপরেই পামেরোর মুখে আটই জুনের হেলিকপ্টারের ঘটনাটা শুনে প্রেমনাথের মুখের রঙ একেবারে পাল্টে গেল। ভূত দেখার মত চমকে উঠে সে বলল,—এ খবর আপনি কোথাথেকে পেলেন?

—খবরটা আমেরিকাতেই পাওয়া গেছে। পামেরো রুমালে মুখ মুছে বলল, তবে আমিও এখান থেকে ওই মাউণ্টেনীয়ারিং ক্লাবের ট্র্যাভেলিং এজেণ্টকে কায়দা করে ফোন করে জানলাম, খবর পাকা।

—তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে মিঃ পামেরো! প্রেমনাথ আতঙ্কের স্বরে বলে উঠল—আটই জুন আমাদের ছেলেরা ওখানেই থাকবে যদি না তার

আগে লাশটা খুঁজে পাওয়া যায়। তার মানে হাতে নাতে সব ধরা পড়ে যাবে।

—আমিও সে জন্য কম চিন্তিত নই। পামেরো গম্ভীর মুখে বলল, তার ফল তোমরা নয় আমরাও ভুগব। এখন কথা হল আটই জুন যাতে ওরা নন্দাখাত পাহাড় থেকে নেমে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—আটই জুনের আর বেশী দেরী নেই সায়েব। মাত্র পাঁচ দিন। প্রেমনাথ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তাহলে এ মুহূর্তে কাউকে পাঠাতে হয় সেখানে।

—না। কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে একাজ করানো যাবে না। পামেরোর স্বরে নির্দেশের আভাস—যেতে হবে তোমাকেই।

—আমি! প্রেমনাথ তাকাল।

—হ্যাঁ.তুমি আর লোমী।

—কিন্তু—প্রেমনাথ অপ্রস্তুত হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই পামেরো বলল আবার—আর কিন্তু নয়। হাজার কাজ থাকলেও তোমাকে যেতে হবে। এর জন্য যা ক্ষতি হবে তোমার আমরা পুষিয়ে দেব। উপায় নেই। এই গাড্ডা থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র রাস্তা তোমাদের ছেলেদের সেই দিন নন্দাখাত থেকে নামিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। সে জন্যই অন্য কাউকে দিয়ে এ কাজ করানো যাবে না।

দুর্গম পথ, পাহাড়, বরফ এসব কথা ভেবে একটু থমকে গেলেও প্রেমনাথ মনে-মনে তখুনি ঝালিয়ে দেখল, কথাটা সত্যি। একে বিনা অনুমতিতে ওরা গেছে এই পর্বত-অভিযানে। তারপর উদ্দেশ্য মারাত্মক। সেনা বাহিনী নিয়ে কথা। তারা যদি ওদের ছেলেদের ওখানে খোড়াখুড়ি করতে দেখে তাহলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে। ব্যাপারটা যে কি, পামেরো সায়েব খুলেও বলেননি সব। এই হারের পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। শেষ পর্যন্ত ওদের পুরো দলটাকে নিয়েই না টানাটানি হয়।

প্রেমনাথ তবু ভাবতে ভাবতে বলল—সবই তো বুঝলাম মিঃ পামেরো কিন্তু, এর মধ্যে যাওয়ার সব ব্যবস্থা—

পামেরো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—সে নিয়ে তোমায় বিন্দুমাত্র ভাবতে হবে না। আমি এখন একটি নামকরা ট্রাভেলিং এজেন্টের কাছ থেকেই আসছি।

তোমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই নাও—কোটের পকেট হাত ঢুকিয়ে একটা নীল রঙের লম্বা প্লেনের টিকিট সে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। আর দু ঘণ্টা পর পাঁচটা কুড়িতে তোমাদের লখনউ যাবার প্লেন। ওখানে সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছ। বলতে বলতে পামেরো আরেক পকেট থেকে বের করল একটা সুদৃশ্য কাগজ। ট্রাভেলিং এজেন্সী ফার্মের প্যাডের একটা পাতা। তার ওপর অনেক কিছু লেখা। সেটা পড়তে পড়তেই ও বলল, রাত নটায় ওখানে তোমরা পাবে নৈনীতাল এক্সপ্রেস, তাতে যাবে হলদওয়ানি অব্দি। সেখানে নেমে বাস পাওয়া যায় তবে তোমরা সোজা ভারারি যাওয়ার জন্য একটা জীপ ভাড়া করবে। ওই ট্রাভেলিং এজেন্ট অফিস থেকেই ইয়ুপি গভর্নমেন্টের ট্যুরিস্ট অফিসে ফোন করে ওরা আমাকে জানাল ভারারি থেকে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার যাওয়ার পথে লোহারক্ষেত নামে একটা জায়গার অনেকটা কাছাকাছি জীপে করে যাওয়া যায়। তোমরা জীপ নিয়ে ওই অব্দি যাবে। যত টাকা লাগে লাগুক, তুমি ভেবো না। মোট কথা ছ'ই জুনের মধ্যে তোমাদের নন্দাখাতের বেস ক্যাম্পে পৌঁছতে হবে। ব্যস তারপর শান্তি। বেস ক্যাম্পে ওয়ারলেস আছে। ওই ওয়ারলেসে ওপরে খবর পাঠিয়ে ওদের নামিয়ে নেবে নীচে। একটা ব্যাপার জেনে রেখ। আট তারিখে ওরা যেন বেস ক্যাম্প থেকেও তাঁবু গুটিয়ে এমন কোনো জায়গায় চলে আসে যেখানে সাধারণ ট্রেকাররা যায়। তারপর আবার ন তারিখে ওরা ফিরে যাবে নিজেদের জায়গায়। এই পেছিয়ে আসা আর এগিয়ে যাবার পুরো ব্যাপারটা তোমরা নিজেদের চোখে পর্যবেক্ষণ করবে তারপর ফিরে আসবে এখানে।

প্রেমনাথ প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলল না। থম মেরে বসে রইল। তবে একটা ব্যাপারে অবাক হল সে। পামেরো সায়েব এর মধ্যে এত খবরাখবর বিশদ ভাবে জানলেন কি করে। মনে-মনে তারিফ না করে সে পারল না। সত্যি এ না হলে নামকরা দলের কর্তাব্যক্তি হন তিনি। কিছুক্ষণ পর সাত-পাঁচ ভেবে ঘাড় নেড়ে সে বলল—ঠিক আছে; তাই হবে। এখন তাহলে আমাকে উঠতে হয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রেমনাথ। তৎপর হয়ে বলল—এইটুকু সময়ে অনেক কাজ আমাকে সেরে যেতে হবে সায়েব।

পামেরো সঙ্গে-সঙ্গে বলল—ঠিক আছে যাও। আমার আর যা বলার লোমীকে বলে রাখব। কিন্তু পাঁচটা কুড়িতে প্লেন, সময়টা যেন মগজে থাকে।

প্রেমনাথ বেরিয়ে গেল।

লোমী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। সেও বেশ চিন্তিত এখন। কোথায় পিণ্ডারি নন্দাখাত। জীবনে এ সবের নাম কখনো শোনেইনি সে। এখন ওকে সেই জায়গায় ছুটতে হবে। তাও গাড়ী-ঘোড়া আগাগোড়া হলে হত। শেষটুকু আবার হাঁটা। তাও সমতল নয় একেবারে পাহাড়। যাক্ কি আর করা যায়। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। নিজেদের এখন চরম সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হলে এই দুর্ভোগটুকু সইতেই হবে। তা না হলে সামনে ঘোর বিপদ। ক্ষোভের সঙ্গে সে কথাটাই সে প্রকাশ করল পামেরোকে—ওফ্ মেয়েটা নিজে মরে যেমন আমাদের বাঁচিয়ে গেছে তেমনি ওই হারখানা গলায় এদ্দূর বয়ে এনে আমাদের ফাঁসিয়েছেও বেশ ! যত সব— !

পামেরো ওর কথায় কান দিল না। কি যেন একমনে ভাবছিল সে। এবার বাকী নির্দেশগুলো দেওয়ার জন্য লোমীর দিকে ঘুরল।

ফুরকিয়া বাংলোর চত্বরে পৌঁছে সৌরভ প্রথম কথা বলল ভানু সিং-এর সঙ্গে—তোমরা কবে পৌঁছলে এখানে ?

—জী কালই। ভানু সিং জবাব দিল। আজ আরো এগিয়ে গিয়েছিলাম ফিরেছি এগারোটায়। তখন থেকে অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য।

—তোমার বাবুরা কোথায় ? মৃণাল জিজ্ঞেস করল।

—ওরা আজ মার্তোলি গুহায় তাঁবু গেড়েছে বাবু। আমাকে তারপর ছেড়ে দিয়েছে। আমি এখন আপনাদের সঙ্গী।

ওর কথা শুনে তাকাল সবাই। কথাটা চাকুরীতে ও বলে ছিল বটে কিন্তু সেটা যে সত্যি-সত্যি পালন করবে কেউ ভাবতে পারেনি।

ফুরকিয়া বাংলোতেও অন্যান্য বাংলোগুলোর মত দুটো স্যুট আছে। ওরা একটায় ঢুকল। এখানেও বাথরুম-খাট-চেয়ার টেবিলের একই ব্যবস্থা। রুক স্যাকগুলো রেখে ওরা আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

বাইরে চারপাশে এখন তুষারের মেলা। কাছেও তুষার দূরেও তুষার। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সেই তুষার স্রোত। নীচে পিণ্ডারির জলেও তুষারের মিশ্রণ। নীল জল সাদা বরফের অপূর্ব সমন্বয়। চারদিকের এই স্নিগ্ধ

পরিবেশ ওদের ক্লান্তির অবসাদ নিমেষেই দূর করে দিল। ওরা বসল পিণ্ডারির উঁচু ধারটায়।

ভানু সিং তখন দূরে দাঁড়িয়ে। সৌরভ ডাকল ওকে।

—তোমার বাবুদের সঙ্গে তাহলে কাল আমাদের দেখা হবে পথে, তাই না? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ তা হবে। ভানু সিং ঘাড় নাড়ল। কিন্তু তাতে কি হয়েছে বাবু। ওরা তো আমায় ছুট্টি দিয়ে দিয়েছে।

—না। সৌরভ বলল, ওদের একটা খাম পড়ে আছে আমাদের কাছে। ওটা দিতে হবে ওদের। কেন, তোমায় বীর সিং কিছু বলে নি?

বীর সিং এখানে অনেক আগেই এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু ভানু সিং মাথা নাড়ল, না বীর সিং কিছু বলে নি ওকে। কি ব্যাপার, কিসের খাম ওটা?

—একটা ছবি আছে ওতে। সৌরভ বলল, ওটা তোমার ওই কালো চামড়ার ব্যাগটায় ছিল। ঢাকুরীতে বীর সিং ব্যাগের ভেতরটা দেখতে গিয়ে পরে রাখতে ভুলে গেছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারল ভানু সিং, গতকাল ওই থলির বাবু কি খুঁজছিল হন্যে হয়ে ওটার ভেতর। শুধু তাই নয় গত রাতে ফুরকিয়াতে এসেও সেই বাবু চুপি চুপি ওর রুক স্যাকটাও তন্ন-তন্ন করে খুঁজে ছিল। আর বার বার জিজ্ঞেস করে ছিল ওকে, থলির ভেতর থেকে কিছু পড়ে গেছে কিনা। তাহলে সেটা এই খামটাই!

এর মধ্যে বীর সিং এল ওখানে চায়ের ডেকচী হাতে। মৃণাল তার আগে প্রত্যেকের মগ গুলো যার-যার রুক স্যাক থেকে নিয়ে এসেছে।

বীর সিং চা ঢেলে দিল প্রত্যেকটায়। তারপর ভানু সিং-এর সঙ্গে ওদের ভাষায় কি কথা হল ওর। প্রথমে ভানু সিং একটু কড়া-কড়া ভাষায় বলল। তারপর দুজনেই কি গূঢ় আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল।

সবশেষে ভানু সিং সৌরভের দিকে ঘুরে উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, বাবু ওই ছবিটা আমাকে একটু দেখাবেন?

উৎপল জিজ্ঞেস করল—কেন?

—বীর সিং বলছে মেয়েটাকে ওর চেনা লাগছে। আমিও বোধ হয়

চিনতে পারব। ভানু সিং আবার অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, একটু যদি দেখান, দেখি কার ছবি ওটা?

উৎপল কি ভেবে চায়ের মগ হাতে বাংলোতে ঢুকল। তারপর নিয়ে এল খামটা। ভেতর থেকে ছবিটা বের করে দিল সে ভানু সিং-এর হাতে।

—হুঁ যা ভেবেছিলাম। ছবির দিকে তাকিয়ে ভানু সিং মাথা দোলাল, বীর সিংএর দিকে তাকিয়ে হিন্দীতেই সে বলল, তুই ঠিকই বলেছিস এ মেমসাবের সাথে আমিই এসেছি। লেকিন এর ফোট্ এই সব বাবুদের কাছে এল কি করে?

—কে এই মেমসাব? উৎপল জিজ্ঞেস করল।

—জী। ভানু সিং ওর দিকে ঘুরে বলল, দো হপ্তা আগে আমেরিকা থেকে এক দল এসেছিল নন্দাখাত পাহাড়ে চড়তে। এই মেমসাব ওই দলের। তবে ইনি নন্দাখাতেই মারা গেছেন।

—মারা গেছে! চার জনেই তাকাল ভানু সিংএর দিকে। কি হয়েছিল?

ভানু সিং তারপর বিশদভাবে বলল সব। ওই দলের ন'জনের মধ্যে পাঁচজন কি ভাবে মারা গেল। তার মধ্যে দুজনের যে লাশ পাওয়া গেছে আর এই মেয়েটি সহ তিনজনের লাশ অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি, তাও বলল।

—তুমি এত সব জানলে কি করে? সৌরভ জিজ্ঞেস করল।

—বাবু আমি ওই একসপিডিশন দলের কুলি সর্দার ছিলাম। ভানুসিং বলল, ওই আমেরিকান দলের সবাইকে আমি ভাল করে চিনি। কিন্তু আমি বুঝতে পরেছি না এই দিল্লীর বাবুদের হাতে এ মেয়েটির ছবি এল কি করে।

সৌরভ আবার বলল, এদের পরিচিত হবে হয়ত মেয়েটি।

উৎপল ভানুসিং-এর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে আবার নতুন করে দেখল। ওরা তিনজনও ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। নন্দাখাত পাহাড়ে অভিযান করতে এসে মৃত্যু হয়েছে এর? শ্রদ্ধায় বেদনায় নত হয়ে এল ওদের দৃষ্টি। মেয়েটির অনাবিল হাসি বুকে শূল হয়ে বিঁধছে এখন। মুখ তুলে তারপর নন্দাখাতকেও দেখল ওরা। অর্থাৎ তিনটে তাজা তরুণ প্রাণের ঘাতককে। নন্দাখাত এখন ওদের সামনে এক ভয়াল মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। মৌন দানবের মত তার শ্বেত শুভ্র বিশাল চেহারা ওদের প্রত্যেকের মনে বিষাদের সঞ্চার করল। তুষারাবৃত

এই পর্বতের কোলে তুটি মেয়ে ও একটি ছেলে এখনো কোথাও পড়ে আছে। বরফের কোন গভীর তলদেশে হয়ত বরফ আঁকড়েই চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। পাহাড়ের নেশায় পাহাড় জয় করতে এসেছিল সেই সুদূর আমেরিকা থেকে। কিন্তু নন্দাখাতের সংহার মূর্তির মরণ গ্রাস ওদের সব উদ্দাম-উৎসাহ নিমেষেই নিভিয়ে দিয়েছে। ঘরের ছেলে-মেয়েরা ঘরে আর ফিরে যেতে পারে নি।

পাঁচটি তরুণ অভিযাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ভয় মিশ্রিত সহানুভূতিতে ওরা ভাব গম্ভীর হয়ে ওখানে বসে রইল অনেকক্ষণ।

মার্তোলি গুহা থেকে ভানু সিংকে বিদায় দিয়ে ওরা নন্দাখাতের বেস ক্যাম্পে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন তুপুর একটা বেজে কুড়ি। গুলসনের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। একে এখানে বরফ ছাড়া চারপাশে কিছুই নেই। তার ওপর এখন একেবারে সামনেই সব বিশাল বিশাল সাদা ধপধপে পাহাড়। তার মধ্যে নন্দাখাত তো তুহাত দূরেই যেন। গুলসন তলা থেকে পাহাড়টার চুড়ো পর্যন্ত তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল নিমেষে। এই ভয়ঙ্কর সব পাহাড় গুলোর কাছাকাছি এসে বুকের ধকধকানি আরো যেন বেড়ে গেছে। নন্দাখাতের ওপারেও কত পাহাড়। পেছনে পিণ্ডারি নদীর ভয়াবহ খাদ। কিছুক্ষণ আগে ওই পিণ্ডারিতে নেমে বরফের পুল পেরিয়ে ওরা এসেছে এই পারে। ওই সাঁকো পেরোতে গিয়ে গুলসনের আত্মারাম একেবারে খাঁচা হয়ে গিয়েছিল। ওফ্ কি সাংঘাতিক পাল্লায় না পড়েছে। যাকে বলে পুরোপুরি মৃত্যু ফাঁদে আটকে যাওয়া। গুলসন শেষ চড়াইটা শেষ করে ধুকতে ধুকতে রাজের রুকস্যাকের ওপর এসে বসল। এছাড়া উপায় নেই। এখানে সবই বরফে ঢাকা। নেই পাথর নেই মাটি। জিংমো ডেভিড আর রাজ এখন আরেকটু ওপরে গিয়ে তাঁবু গাড়ার জায়গা খুঁজছে। তাঁবু আর বরফ পরিস্কার করার সাজ-সরঞ্জাম সবই ওরা নিয়ে গেছে সঙ্গে।

গুলসন নন্দাখাত থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরাল। কিন্তু কোথায় ও তাকাবে। যেদিকেই তাকাও সেদিকেই বিদঘুটে সব দৃশ্য। বরফের উঁচু-নীচু ভয়াবহ ছবি। গভীর খাদ। ওদিক থেকে কম উঁচু ত এদিকেও পাহাড়ের কমতি নেই। সারির পর সারি। নির্জন নিস্তব্ধ।

তখনই গুলসনের মনে পড়ে গেল হারিয়ে যাওয়া ছবিটার কথা। মনে পড়তেই ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল ওর পিঠ দিয়ে। গত রাতে ডেভিডের অসুস্থতার জন্য ফাঁড়াটা কাটলেও আজ নিস্তার নেই। আজ ডেভিড ছবিটা চাইবেই। কারণ কাল ভোরে ওরা ওই ছবি নিয়ে রওনা হবে দুর্ঘনাস্থলের জন্য। তখন? গুলসনের বুক শির শির করে উঠল। এ মুহূর্তে ওর চোখে ভাসছে ডেভিডের নৃশংস মুখ। ওর মনে হল যেন ডেভিড খামটা হারিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে ওই খাদে। খাদটার দিকে তাকিয়ে মরণ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল গুলসন। আশ্চর্য্যের কিছু নেই। নিষ্ঠুর নৃশংস খুনী ডেভিড এর চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে তখন। মাথায় খুন চাপলে ক্রুদ্ধ কাল কেউটের চেয়েও সে বিপজ্জনক।

ভাবতে ভাবতে এই মরণ শীতেও গুলসনের শরীরটা ঘেমে উঠল কুল কুল করে। তারপরেই সেই চিন্তাটা মাথায় আবার ঘনিয়ে এল। গতকাল সন্ধের সময়ও কথাটা ভেবেছিল গুলসন। ডেভিড ফটোটা চাওয়ার আগে এখান থেকে একেবারে সটকে গেলে কেমন হয়। কিন্তু তখন অন্ধকার রাত বলে এ নিয়ে বেশী ভাবতে পারেনি। অবশ্য দিনে দিনে ও সটকাবে কেমন করে? রাজ সব সময় সেঁটে আছে জোঁকের মত। আর একা-একা এই পথে ফিরে যাওয়া! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু এ মুহূর্তে—! রাজ আবার ভাবল কথাটা। আজ রাতে ওই হারানো ছবি নিয়ে অনেক মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এরকম ভয়ঙ্কর পরিবেশে ক্রুদ্ধ ডেভিডের মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র সাহস ওর নেই। গুলসন সজোরে নিশ্বাস নিতে নিতে একবার তাকাল নীচের পথটার দিকে। যে পথ দিয়ে এই মাত্র ওরা এসে পৌঁছেছে এখানে। তারপর তাকাল ওপরের দিকে। ডেভিড জিংমো রাজ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদের কথাবার্তা ও ঠোকাঠুকির আওয়াজ ভেসে আসছে। নেমে যাওয়ার পথটা ঢালু তারপর এখনও দিনের বেশ কিছুটা বাকি। ফুরকিয়া এখান থেকে একটু দ্রুত পায়ে গেলে সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ডেভিডও পরে টের পেলে পেছু নেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ফুরকিয়াতে লোকজন থাকলে সবার সামনে ও কিছু করতে পারবে না। তারপর যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু আর নয়, আর পারছে না গুলসন। এই বিদঘুটে ভয়াবহ পাহাড় আর তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ডেভিড ওর রাতের ঘুম, দিনের

ন্ত কেড়ে নিয়েছে। আজ হয়ত ওই ছবির জন্য এমনিতেই ওর মৃত্যু আসন্ন। র চেয়ে—

গুলসন উঠে চটপট পাশে পড়ে থাকা রুক স্যাকগুলোর মধ্যে নিজের ক স্যাকটা হাতড়ে একটা টর্চ বের করল। তারপর নিল রাজের ওয়াটার লটা। ব্যাস, আর কিছু নয়। একবার শুধু পেছন ফিরে ওপরে তাকিয়ে রপর দ্রুত পায়ে নীচে নামতে শুরু করল। মরীয়া গুলসন এখন বেপরোয়া য় উঠেছে। গায়ে জোরও ফিরে পেয়েছে অসীম। ওকে ফুরকিয়া খুব াড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে। লম্বা লম্বা পায়ে বরফের ওপর দিয়ে প্রায় সে টতেই শুরু করল।

কিন্তু পারলো না বেশী দূর যেতে। মুক্তির আশায় বরফের ঢালে দিগ্বিদিক ন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পা পিছলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ দিকের গভীর াদের দিকে প্রবল বেগে ছুটে চলল ওর শরীর। গুলসন চীৎকার করে উঠল -বাঁ-চা-ও! কিন্তু কে তখন ওকে বাঁচাবে! কাছে কেউ থাকলেও তা সম্ভব ছল না। গুলসন শেষবারের মত তাকাল মরণ খাদটার দিকে। এখন পর্যন্ত পরাধ জগতে থেকে তিন জনকে ও খুন করেছে। এ মুহূর্তে ও দেখতে পেল র হাতে নিহত সেই তিনটি মুখ খাদের ভেতর থেকে ওরই দিকে তাকিয়ে াছে জ্বলজ্বল করে। সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে গেল গুলসনের মুখ। জ্ঞান বিয়ে গড়াতে গড়াতে খাদের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওর শরীর।

গুলসনের মরণ চীৎকার ওই নির্জন পরিবেশকে খান্ খান করে ফেলেছিল। র গলা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলেও সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে াহাড়ে বেজে উঠছিল তখন। তাই শুনে বিস্মিত হতবাক ডেভিডরা ছুটে ল ওপর থেকে। ছুটতে ছুটতে ওরা নীচে এল। যেখানে পড়ে ছিল রাজের লের বোতলটা। তারই পাশে খাদ পর্যন্ত বরফ আকঁড়ে ধরার কিছু চিহ্ন।

ওরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে খাদটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

রাজ সব শেষে বলল, ওকে কি বাঁচানো যাবে না?

ডেভিড খাদের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, ও কি আর বেঁচে আছে। াকলেও আর কতক্ষণ।

জিংমো নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, ফিক্সড রোপ লাগিয়ে নামা যায়। াড়ান আমি নিয়ে আসছি সব জিনিষ পত্র। ও ছুটে গেল ওপরে।

ডেভিড ঘুরে রাজকে অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার। ও সা— এদিকে এসেছিল কেন ?

—আমার মনে হয় রাজ এক চোখ ছোট করে বলল, চাঁছু কেটে পড়ার তালে ছিল। গতরাত থেকে ওর হাল-চাল আমি ঠিক সুবিধের দেখছি না।

—আচ্ছা তো এই ব্যাপার! ডেভিডের মুখের ভাবেও পরিবর্তন হল। থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে ঠোঁট বাঁকা করে একটা বিশ্রী গালাগাল দিল সে—

—ভালই হয়েছে। একে নিয়ে কিচাইন হত পরে। কিন্তু ছবিটাও যে সাথে নিয়ে গেল হতভাগা।

এর মধ্যে কাঁধে গোল নাইলনের দড়ি ও বরফের 'এংকর' নিয়ে জিংমো এসে হাজির।

ডেভিড ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি মনে হয় তোমার? ছেলেটা বেঁচে আছে।

—বোধহয় নেই। তবু দেখতে হবে নিচে গিয়ে।

—ঠিক আছে। তাই দেখো। ডেভিড ওকে নির্দেশর সুরে বলল, তবে বেঁচে থাকলেও ওকে ওপরে নিয়ে আসার দরকার নেই। ছোঁড়াটা না মরলেও নিশ্চয়ই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ওর জামার তলায় একটা কালো রঙের খাম আছে। তোমাকে শুধু ওটা নিয়ে আসতে হবে। ও ওখানে পড়ে থাকুক।

জিংমো হতবাক হয়ে তাকাল ডেভিডের দিকে। লোকটা বলে কি! বেঁচে থাকলেও ওকে নিয়ে আসবে না ওপরে। তার মানে! তাহলে ও কি করতে নামবে নীচে। শুধু একটা খামের জন্য! জিংমো এমনিতেই ডেভিডদের ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। কদিন ধরে ওদের কথাবার্তর ধরন আর চাল-চলন দেখে গা রি রি করছিল ওর। একটু গম্ভীর স্বরে বলল, আপনি কি বলতে চান! ছেলেটাকে জীবিত দেখলেও আমি ওপরে নিয়ে আসব না!

—না! ডেভিড ওর গলার স্বর আরো ধারালো করে বলল, তুমি শুধু নীচে যাবে ওর জামার তলার খামটা উদ্ধার করতে।

—তা হয় না সিংজী। জিংমো মাথা নাড়ল। আমি ওকে উদ্ধার করতেই নামব। জীবিত হোক কিংবা মৃত। পাহাড়ী পথে খুব অসম্ভব না

হলে কোনো সঙ্গীর মৃতদেহকেও আমরা এভাবে ছেড়ে যেতে পারিনা। তার উপযুক্ত চিকিৎসা অথবা সৎকার করে তবেই আমরা এগোবো।

জিংমোর এই উদ্ধত ভঙ্গী দেখে একটু থমকে গেল ডেভিড। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। যে জন্য এখানে আসা সেই আসল কাজটি করতে হলে এখন জিংমোকে চটালে চলবে না। তাই এবার ও সংযত স্বরেই বলল, ছেলেটা ওই অতল বরফের খাদে পড়ে গিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না জিংমো। সে জন্যই আমি বলছি যে ওকে শুধু শুধু ওপরে নিয়ে এসে লাভ কি। বরং ওর জামার তলায় খামটার খুব প্রয়োজন আমাদের। ওই খামে আছে মেয়েটির ছবি যার লাশ আমরা উদ্ধার করতে চলেছি।

জিংমো এংকরটাকে খাদের পাশে বরফে বসাতে বসাতে বলল, আমি পারলে সব সুদ্ধই শার্দুলকে নিয়ে আসছি। তারপর আপনারা নিজেরা খুঁজে নেবেন যা প্রয়োজন।

ডেভিড একবার তাকাল রাজের দিকে। ক্রোধে প্রায় ফেটে পড়ছিল ওর চোখ। কিন্তু এখন সে নিরুপায়। তাই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কি ঘটতে চলেছে তা দেখার জন্য।

রাজ জিংমোর ডাকে এগিয়ে গেল ওকে সাহায্য করতে।

এংকরটা খাদের ধারে ভাল মত বসিয়ে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে শেষ পর্যন্ত জিংমো নামল সেই খাদে। দড়ি ধরে ধরে নীচে নামা। নামতে বেশিক্ষণ লাগল না। মাথায় ওর টর্চ লাগানো হেলমেট। কোমরে ব্যাটারী। আর হাতে একটা আইস একস। ডেভিড আর রাজ নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর ওপরে উঠল জিংমো। বরফের কুঁয়ো থেকে বেরিয়ে ওর অবস্থা তখন প্রায় মরণাপন্ন। বরফের কুচো লেগে রয়েছে সারা গায়ে। প্যান্ট জুতো সুদ্ধ কোমর পর্যন্ত ভেজা কিন্তু হাতে বা কাঁধে আইস একস্ ছাড়া কিছু নেই।

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বেশ কিছুক্ষণ পর সে বলল, শার্দুল মারা গেছে। কিন্তু ওর শরীরটা আমার নাগালের বাইরে। খাদের মধ্যে আবার খাদ। একটা ক্রিভাসে ঢুকে পড়ে আছে।

ডেভিড একটু চিন্তিত স্বরে বলল—ওর জামা-কাপড়ও ছুঁতে পারলে মা

—না! জিংমো শরীরের বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, ত্রিভাসের মুখ খুব সরু। তার ভেতর প্রায় দু মানুষ নীচে ও পড়ে গেছে।

পরের দিন সকাল আটটার একটু পরে ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্পের জন্য হাঁটা শু করল সৌরভরা। রাস্তার বরফ শক্ত থাকায় এর আগে ওরা বেরোতে পার না। চারপাশে এখন অপরূপ দৃশ্য। গতকালের দেখা তুষার-পরিবেশ এ সকালের আলতো রোদে আরো মোহময় হয়ে উঠেছে। সামনের বালজো পানওয়ালী ধার ও নন্দাখাতের শিখরে এখন রক্ত-রঙীন আভা।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে আরো বিচিত্র সব রঙের খেলা দেখতে দেখতে ও এগিয়ে গেল। ওরা চারজন, বীরসিং আর ভানু সিং। তা ছাড়া সঙ্গ পিণ্ডারি নদী তো রয়েছেই।

কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সামনে রাস্তা নেই। পাহা থেকে তুষার নেমে ঢেকে দিয়ে গেছে। ভানু সিং আর বীর সিং আগে প চালাল তার ওপর দিয়ে। তারপর ওরা। বরফে চলার জন্য চারটে শ লাঠি ওরা ফুরকিয়াতে কাল যোগাড় করে নিয়েছে। সেই লাঠি বরফের চা ঢুকিয়ে শরীরের ভার সামলাতে সামলাতে ওরা এগিয়ে চললো। দীর্ঘ তুষা পেরিয়ে কিছুটা মাটি তারপর আবার বরফ। এ-ভাবে তুষারের পর তুষা পেরিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত মার্তোলি গুহাতে পৌছল ওরা। গুহ বলতে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে রোদ-বৃষ্টি তুষার-পাত থেকে রক্ষা পাওয় একটা আশ্রয়। অবশ্য এই আশ্রয়ই অনেক সময় কাতর পথিকের প্রাণ র করে। ফুরকিয়াতে না থেকে অনেক ট্রেকার এখানেও এসে থাকে। সাম একটা প্লাস্টিক শীট ঝুলিয়ে নিলেই এই গুহা আরো সুরক্ষিত হয়।

গুহার বাইরে পড়ে আছে কাঠ, টিন ফুডের খালি কৌটো, ও পরিত্য কিছু খাবার। খাবারের টুকরোগুলো খুব বাসী। দেখে মনে হল অন্ত সাত আট দিন আগেকার।

ভানু সিং গুহাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, আমরা কাল এ অব্দি এসেছিলাম। কিন্তু গুহার কাছে গিয়ে ভেতরে ও বাইরে তাকিয়ে এ অবাক হল সে। চোখ-মুখ কুঁচকে তারপর কি কথা বলল বীর সিংএর সঙ্গে

উৎপল ওদের কথাবার্তা শুনে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার ভানু সিং ?

—জী। ভানু সিং চারপাশে আবার তাকাতে তাকাতে ওকে বলল, এই সাহেবরা বলেছিল কাল সারা দিন-রাত এখানে ডেরা ডালবে। তারপর আজ যাবে পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার কিন্তু এখানকার হাল-চাল দেখে মনে হচ্ছে ওরা কাল এখানে থাকেনি।

—ও। তার মানে কালকেই ওরা পিণ্ডারি চলে গেছে। সৌরভ শুনে উৎপলকে বলল, তাহলে চল্। ওখানেই দেখা হবে ওদের সঙ্গে।

উৎপল ওর কথায় কান না দিয়ে ভানু সিংকে জিজ্ঞেস করল, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। তোমাকে যখন ওরা ছেড়েই দিল তাহলে সঙ্গে এনেছিল কেন ?

—মাল বয়ে আনার জন্য। ভানু সিং জবাব দিল, ওই সাহেবদের মাল যে বহোত।

—ওই মাল ফেরত নিয়ে যেতে হবে না ? তখন কুলী পাবে কোথায় ?

—মাল ওরা নিজেরাই বহোত বইতে পারে বাবু। ভানু সিং উৎপলের দিকে তাকিয়ে বলল, তা ছাড়া কিছু খানা-পিনার মাল তো ওদের খতম হবে এখানে। তখন বোঝাও হালকা হবে।

—ওরা থাকবে এখানে কয়েক দিন ? উৎপল আবার জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ বাবু। ওরা তাই আমায় বলেছে।

—কিন্তু কেন ? কিসের জন্য এসেছে ওরা এখানে ? শুধু বেড়াতে না অন্য কিছু।

—আমাকে ওরা বলেছে কি রিসার্চ লেখাপড়ার খোঁজ-খবর কি করবে। এখানকার পাত্থর-টাত্থর নিয়ে কিছু দেখা শোনা হবে। সেজন্যে ওদের সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতিও আছে।

—তাই বল। সৌরভ এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার বলল, ওরা তাহলে জিওলজির লোক।

মৃণাল বলল, বাঃ ওদের সঙ্গে দেখা হলে তো ভাল হয়। আমার জিওলজি আছে।

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল একটা ঘাসের জমি। বাঁ দিকের খাড়া পাহাড়ের এখানেই ইতি। তারপর জীরো পয়েন্ট।

কিন্তু তার আগেই চারপাশের অজস্র তুষার শ্রেণী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের। যে নন্দাখাতের দিকে দৃষ্টি রেখে ওরা হাঁটছিল এতক্ষণ সেটা এখন বলতে গেলে ওদের প্রায় হাতের ছোঁয়ার মধ্যে। তার উত্তরে এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় নন্দা দেবী। ডান দিকে আরো বহু শৃঙ্গ। পিণ্ডারি হিমবাহ নেমে এসেছে নন্দাদেবী আর নন্দাখাতের মাঝখানের ঢাল বেয়ে। ডানদিকে নন্দাকোট। এই হিমবাহ যেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার নাম ট্রেইল পাস। ট্রেইল পাসের উচ্চতা পাঁচ হাজার মিটারেরও বেশি। অর্থাৎ সামনে এখন শুধু তুষার জগৎ। ওপরেও তাই নিচেও তাই। পিণ্ডারি স্নাউটেরও কোনো পাত্তা নেই। কারণ এখানে পিণ্ডারি নদীও তুষারে পরিণত। পিণ্ডারি হিমবাহের ভয়ঙ্কর গিরিখাতে যে অজস্র শিলাখণ্ড পড়ে থাকে সেগুলোও তুষারমণ্ডিত। মন্ত্রমুগ্ধের মত বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা সেখানে।

বীর সিং তারপর বলল, চলুন বাবু আরো ওপরে উঠতে হবে। আজ তাঁবু গাড়তে হবে মনে আছে তো?

এবার ওরা ডান দিকের ছাঙ্গোছ পাহাড়টার দিকে তাকাল। ওটা এত কাছে যেন মনে হল একেবারে ওদের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে। এরই সামান্য ওপরে উঠবে ওরা। উৎপল হঠাৎ ঘুরে বলল—ভানু সিং কোথায়?

বীর সিং বলল—ওর পুরনো বাবুদের খুঁজছে।

বলতে বলতে ভানু সিং পেছন থেকে ছুটে এল। —তাজ্জব কি বাত। ওদের কারো পাত্তা পাচ্ছি না বাবু। ভানু সিং এসে আবার তাকাল চারপাশে। বিড় বিড় করে বলল, গেল কোথায়! বলেছিল এখান অব্দি আসবে।

—দেখো আরো এগিয়ে গেছে হয়ত। সৌরভ মন্তব্য করল।

—এগিয়ে আর যাবে কোথায়। ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প। চলুন দেখি গিয়ে। ভানু সিং এগোলো ছাঙ্গোছ পাহাড়ের রাস্তায়।

নাম ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প হলেও রাস্তাটা এমন কিছু কঠিন নয়। খুব উঁচুও নয়। তবে বরফ থাকার জন্যই যা অসুবিধে। সে বরফ আবার এখন দুপুর বারোটার রোদে অনেক নরম হয়ে গিয়েছে। তাই খুব বিপজ্জনক নয়। ভানু সিং ওপরে উঠতে উঠতে বলল, বাবু অন্য বছর এ সময় এই পথেও বরফ থাকে না। কিন্তু এবছর যা বরফ পড়েছে আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

—এই বরফের জন্যই এবার এদিকে টুরিষ্ট এত কম, তাই না। দীপক জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ বাবু। ভানু সিং ঘাড় নাড়ল। অনেকে তো এই সেদিনও ফুরকিয়া থেকে ফেরত গেছে। আর আগে যেতে পারে নি। আপনাদের সাহস আছে তাই এদ্দূর চলে এলেন।

—শুধু সাহস নয়। বল ক্লাইম্বিং শুও আছে পায়ে। সৌরভ হেসে বলল. তা না হলে এই বরফ মাড়িয়ে আসতে পারতাম?

কথা বলতে বলতে ওরা সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছল যেখানে তাঁবু গাড়ার মত একটু মাটি ও তুষার ছাড়া শীলাপ্রস্তর আছে। কিন্তু এখানেও চারপাশে কোথাও কোনো প্রাণের হদিশ নেই। অন্য কোনো তাঁবুর ছিটে-ফোঁটাও নজরে পড়ল না। ভানু সিং ঘুরে ঘুরে সব দিক দেখে ফাঁপড়ে পড়ল একেবারে। কোথায় মিলিয়ে গেল ওরা তাহলে।

দীপক বলল, দাঁড়াও আমি বাইনোকুলারটা এবার বের করি।

বলে পিঠের রুকস্যাকটা একটা পাথরের ওপর নামিয়ে ছোট্ট বাইনো-কুলারটা বের করল। তারপর ওটা ভানু সিংএর হাতে দিয়ে বলল, নাও খুব জোরদার দূরবীন নয়। তবু এটা দিয়ে দেখো কারো কোথাও পাত্তা পাও কিনা।

ভানু সিং ওটা চোখে লাগিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। ওরা চারজনও তখন ঘুরে ঘুরে মোহিত হয়ে দেখছে সব। সেই একই তুষার জগৎ। কিন্তু সেটা এখান থেকে আরো মনোরম আরো কাছের হয়েছে। শুধু তাই নয় এখানে উঠে ওদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে তুষার শৃঙ্গের সংখ্যাও বেড়েছে বহু। চারপাশে বিশাল-বিশাল সাদা তাঁবুর মত দাঁড়ানো অজস্র গিরি শিখরের সমারোহ।

ভানু সিং হতাশ হয়ে বাইনোকুলারটা ফেরত দিল দীপকের হাতে।—না বাবু ওরা হাওয়া হয়ে গেছে। কে জানে কোথায় গেছে। আমি যাই তাঁবুটা গাড়ি এবার।

বীর সিং আর ও তারপর তাঁবু গড়তে লেগে গেল।

লোহার ক্ষেত থেকে ঢাকুরী হয়ে সেদিন বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে খাতিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন ডাক্তার বোস। তিনি আগামীকাল সারাটা দিন থাকবেন

এখানে। সেজন্যই আজ আর ওষুধ পত্র নিয়ে বসবার প্রয়োজন নেই। খাতিতে আশে-পাশের গ্রাম থেকে বহু লোক তার কাছে চিকিৎসা করাতে আসে। তবু এদিককার জনসংখ্যা এত কম যে সবাই এলেও ডাক্তার বাবুর একটি দিনই যথেষ্ট। পরশু এখান থেকে তিনি ফুরকিয়া যাবেন। তার পরের দিন জিরো পয়েণ্ট দেখে দোয়ালী। তারপর আবার খাতি। সেদিন প্রয়োজন মত কিছু রোগী দেখে যাবেন এখানে। এই তার কর্মসূচী। কিন্তু জিরো পয়েণ্ট পর্যন্ত এবার যেতে পারবেন কিনা সেটাই সন্দেহ। পথে আসতে আসতে অনেকের কাছে তিনি শুনেছেন ফুরকিয়ার পর থেকে বরফ পড়ার কথা। অনেকে ফিরে এসেছে। খাতি বাংলোর লনে চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে এই কথাই ভাবছিলেন ডাক্তার বোস।

সমীরণ তখন বাংলোর ছোট্ট প্রাচীরে বসে চৌকিদারের সঙ্গে গল্প করছে। ওদের দু জনেরও হাতে চায়ের কাপ।

হঠাৎ গ্রামের দিক থেকে উঠে এল পরিষ্কার কুর্তা পাতলুন পরা জনৈক বয়স্ক লোক। তাকে দেখেই চৌকিদার সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করল। ইনি খাতির মুখিয়া অর্থাৎ গ্রাম প্রধান। নাম বিক্রম সিং কিন্তু সবাই মুখিয়াজী বলেই ডাকে। সমীরণেরও পরিচিত। কাছে আসতে সেও নমস্কার করল।

—বেঁচে থাক বাবা। হাতজোড় করে মুখিয়াজী বললেন, ভাল কুশল সব সমাচার ?

—হ্যাঁ মুখিয়াজী আপনার কৃপায় সব ঠিক। সমীরণ চোস্ত হিন্দীতে বলল। এ সব অঞ্চল বার বার ঘুরে সেও আদব কায়দা সব জেনে গেছে।

মুখিয়াজী ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। —বাবুজী নমস্কার !

—আসুন আসুন মুখিয়াজী। ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন। চৌকিদার ছুটে গিয়ে আর একটা চেয়ার নিয়ে এল বাংলোর বারান্দা থেকে। মুখিয়াজী বসলেন তার ওপর।

—বলুন, শরীর কেমন ? ডাক্তারবাবু চৌকিদারকে একটা চা আনতে বলে তাকালেন তাঁর দিকে।

—শরীর মোটামুটি ঠিক বাবুজী। শুধু গাঠিয়াটা মাঝে মাঝে দরদ দেয়। মুখিয়াজী কোমরে হাত দিয়ে বললেন, তবে আপনি যে গতবার গোলীগুলো

মুখিয়াজী কোমরে হাত দিয়ে বললেন, তবে আপনি যে গতবার গোলীগুলো দিয়ে গিয়েছিলেন, ওতে অনেক ভাল থেকেছি। এখন সেই গোলীও নেই তাই জড়ি বুটি-সবন করছি।

—ঠিক আছে আমি সেই গোলী আরো দিয়ে যাব আপনাকে। ডাক্তারবাবু খালি কাপটা মাটিতে রেখে বললেন, তারপর বলুন এদিককার খবর কি? বরফ নাকি এবার খুব পড়েছে?

—ওফ্ বহুত বরফ বাবুজী। এরকম বরফ আমি একবার জওয়ানীতে দেখেছিলাম। এবার—

এরকম আরো কিছু কথা বার্তার পর মুখিয়াজী হঠাৎ বললেন, বাবুজী আমি কিন্তু আপনার কাছে এখন অন্য দরকারে এসেছি।

—বলুন।

মুখিয়াজী একবার তাকালেন এদিক ওদিক। চৌকিদার চা নিয়ে আসছে। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে আরো একটু অপেক্ষা করলেন তিনি। চৌকিদার দূরে চলে যেতে তারপর স্বর নামিয়ে বললেন, আপনি সুন্দরবাবার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।

সুন্দরবাবা হলেন এই এলাকার ঋষি-তুল্য সাধু। এখান থেকে বহুদূরে এক দুর্গম পাহাড়ে গুহার মধ্যে থাকেন তিনি। প্রায় কুড়ি বছর ধরে সভ্য জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। জঙ্গলের ফল-মূল খেয়ে গাছের ছাল পরে তিনি এই দীর্ঘ দিন সেখানে আছেন। বছর দুয়েক আগে লখনউয়ের একটি খবরের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আজগুবী খবর বেরোয়। সুন্দরবাবা নাকি জানে না। দেড়শ বছরও হতে পারে দুশ বছরও। সেই খবরের পর কয়েকজন অতি উৎসাহী মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাঁর মধ্যে একজন বিদেশী সাংবাদিকও ছিলেন। কিন্তু কারো সঙ্গে তিনি দেখা করেননি। তিনি তাঁর ত্রিসীমানায় লোকজন একদম পছন্দ করেন না। তখন কিছু লোকের যাতায়াত শুরু হওয়াতে সুন্দরবাবা আরো গহন তুষারাবৃত পাহাড়ে ঢুকে পড়েন। আবার তিনি তাঁর পুরোনো জায়গায় ফিরে এসেছেন এক বছর হল। সেই সুন্দরবাবার তিন-চারজন মাত্র শিষ্য আছে এই আশে-পাশের গ্রামে। তাঁরা সবাই খুব বয়স্ক। এবং একমাত্র তাঁরাই তার কাছে যেতে পারে। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হলেন মুখিয়াজী।

গতবছরই সুন্দরবাবার কথা এখানে দু-একজনের মুখে শুনেছিলেন ডাক্তার-বাবু। তাই তিনি মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ শুনেছি। আমি গতবার যখন এসেছিলাম তার কয়েকদিন আগেই বোধহয় তাঁর পুনরাবির্ভাব হয়েছিল এখানে।

—হ্যাঁ এখানে বলতে তাঁর গুহায়। মুখিয়াজী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন। সেই সুন্দরবাবা আপনার খোঁজ করছেন।

ডাক্তারবাবু শুনে হতবাক। —আমার খোঁজ করছেন? কি বলছেন আপনি। আমাকে চেনেন নাকি তিনি।

—চেনেন বলতে আমিই আপনার কথা বলে ছিলাম তাকে?

—কেন?

—এমনি। মুখিয়াজী মৃদু হাসলেন। আপনি এখানে গত দু বছর আসছেন। তার আগে তো এই সুন্দরবাবাই আমাদের কঠিন রোগ সারাতেন। বহু জড়ি বুটির খবর রাখেন। আমাদের গ্রামে কারো কোনো সাংঘাতিক কিছু হলে আমিই তার কাছ থেকে জড়ি-বুটি নিয়ে আসতাম। এখনও মাঝে মাঝে নিয়ে আসি। এই সব নিয়ে কথাবার্তায় একদিন বলেছিলাম বাবাজীকে। আপনি দু বছর ধরে নিয়মিত একবার এখানে আসছেন বলে কত উপকার হচ্ছে আমাদের।

—কিন্তু তিনি আমার খোঁজ করছেন কেন? নিশ্চয়ই তাঁর রোগ সারাতে নয়।

—না, না বাবুজী সুন্দরবাবার কোনদিন কোনো রোগ হতে দেখিনি। তাছাড়া তিনি নিজেই কত ওষুধ জানেন।

—তাহলে?

—বুঝতে পারছি না বাবুজী। মুখিয়াজী তার চোখে-মুখে রহস্যের আভাস এনে বললেন—কি জন্য এভাবে তিনি আপনার খোঁজ করছেন, আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না। আমি সাতদিন আগে গিয়েছিলাম তার কাছে। তখন তাকে খুব উত্তেজিত ও চিন্তিত দেখেছি। এরকম চিন্তাগ্রস্ত তাকে কখনো দেখিনি। তার পরেই তিনি আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কবে এদিকে আসছেন, জানতে চাইলেন। আমি বললাম। শুনে তিনি আমায় নির্দেশ দিলেন, আপনি আসা মাত্র তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে

যেতে। পরশু জাতোলী গ্রাম থেকে আমার এক গুরুভাই গিয়েছিল। তার মারফতেও তিনি খবর পাঠিয়েছেন, আমি যাতে আপনাকে নিয়ে যেতে দেরী না করি।

ডাক্তারবাবু অবাক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মুখিয়াজীর চোখের দিকে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরো দুর্বোধ্য লাগল। তবে পর মুহূর্তেই তিনি পুলকিত হলেন মনে মনে। সুন্দর বাবার মত এক দুর্লভ নমস্য সাধু নিজে তাঁর খোঁজ করছেন একি কম ভাগ্যের কথা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নাকি কত ভি. আই. পিও লালায়িত। অতএব যে কারণেই তিনি খোঁজ করুন না কেন, এ সুযোগ কখনো হারানো যায়! তিনি কথাটা ভাবা মাত্র বলে উঠলেন, ঠিক আছে মুখিয়াজী। তাহলে কবে নিয়ে যাবেন তার কাছে আমায়?

—কাল। মুখিয়াজী চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, ভোর বেলায় বেরিয়ে আবার সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব আমরা।

—কিন্তু, কাল যে এখানে আমার বসার কথা। সবাই তাই জানে।

—না, বাবুজী। মুখিয়াজী মাথা নাড়লেন। আমি এই যাওয়ার কথা ভেবেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি আপনি পরশু এখানে বসবেন। এমন কি ওয়াছাম জাতোলি গ্রামেও এই খবর পাঠানো হয়ে গেছে।

—বাঃ ভাল করেছেন তাহলে। কাল কখন বেরোব আমরা?

—পাঁচটায়, দেরী করব না। রাস্তাটা একটু কঠিন আছে। অবশ্য আপনি যদি বলেন কিছু দূর অব্দি খচ্চর নিতে পারি আপনার জন্য।

—না। খচ্চরের কোনো প্রয়োজন হবে না। ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হাঁটতেই তো এসেছি এখানে। হোক না কঠিন। যেখানে আপনি যেতে পারবেন আমি কি একটু কষ্ট করেও যেতে পারব না?

আরো কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর মুখিয়াজী চলে গেলেন।

পরের দিন সকাল সাতটায় ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্পের ছবি একেবারে অন্য রকম। নীল রঙের তাঁবুর সামনে একটা বড় প্রস্তর খণ্ডের ওপর বিষাদগ্রস্ত মন নিয়ে বসেছিল চারজন। সৌরভ, উৎপল, মৃণাল ও দীপক। প্রত্যেকের মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ, গায়ে পুল-ওভার উইণ্ড-চিটার ও হাতে দস্তানা। একটু

আগে ওদের রকস্যাক গুছোনো হয়ে গেছে। তার কিছুক্ষণ আগে দেখা হয়েছে এখান থেকে এক রোমাঞ্চকর সূর্যোদয়। যে সূর্যোদয়ের মাধুর্য্য ওরা সারা জীবন বোধ হয় ভুলতে পারবে না। এখন ওরা বসে বসে দেখছে চারপাশের তুষার-শৃঙ্গে রঙের পট পরিবর্তন। কিন্তু এর পরেই বিদায়ের পালা। অর্থাৎ যে লক্ষ্যের জন্য গত তিন মাস ধরে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল। যেখানে পৌঁছনোর তাগিদে অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন হেঁটেছে, সেই ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প অভিযানের এখানেই ইতি। এই পার্বত্য তুষার-জগতের নিঃসীম নির্জনতা ছেড়ে আবার ওদের ফিরে যেতে হবে সেই সমতলের কোলাহলময় ব্যস্ততার মধ্যে। স্বভাবতই এ মুহূর্তে সবার খারাপ একটু লাগবেই।

জীবনের অনেক বিরল অভিজ্ঞতা হল এই ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্পে—বরফ গলিয়ে জল খাওয়া থেকে শুরু করে গভীর রাত্রে প্রবল কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ শুনে ভয় পাওয়া। তার ওপর আছে কাল থেকে এ মুহূর্ত অব্দি দেখা চারপাশের অপূর্ব দৃশ্যাবলী। স্বপ্নের ঘোরে কাটল যেন মুহূর্তগুলো। সে এক অতুলনীয় অনুভূতি। প্রকৃতি যে ক্ষণে ক্ষণে কত সুন্দর হতে পারে সব আঁকা হয়ে রয়েছে ওদের মনে। কলকাতায় ফিরে উষ্ণ ঘরের কোণে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গরম কফি খেতে খেতে যখন ভাববে এসব কথা তখন এগুলো আরো শিহরণময় মনে হবে।

—বাবু চায়। বীর সিং আর ভানু সিং এসে মগে-মগে চা পরিবেশন করল ওদের।

বীর সিং বলল, বাবু খাতি থেকে আনা মিট্রির তেল সব শেষ। তাই চা বেশি গরম হয়নি।

—তাতে কি হয়েছে। একটু গরমের ছোঁয়া এখন পেলেই হল। যা কনকনে শীত। এতেই অনেক আরাম পাবো। বলে সৌরভ চুমুক দিল মগে।

বীর সিং আর ভানু সিং চা খেয়ে তারপর তাঁবু গুটোতে লাগলো। ওটাই এখন বাকি একমাত্র।

তার আধ ঘণ্টা পরেই নামতে শুরু করল ওরা, উৎপল দীপকের বাইনোকুলারটা নিয়ে একটু আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওদের বাঁ দিকে বিশাল নন্দাখাত। বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে সেদিকেই তাকিয়েছিল সে। হঠাৎ কি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—সৌরভ দৌড়ে আয়! বাইনোকুলারটা চোখ থেকে নামিয়ে ওকে ডাকল উৎপল।

সৌরভ ছুটে এল। ওর হাতে বাইনোকুলারটা দিয়ে বলল, দেখ কিছু দেখতে পাচ্ছিস কিনা।

সৌরভ দেখল দুটো লোক নন্দাখাতের তুষারবৃত ঢাল দিয়ে ওপরে উঠছে। ওদের হতে আইস একস ছাড়াও বেলচার মত কিছু রয়েছে। এর মধ্যে ভানু সিংও এল। ভানু সিংকেও দেখাল ওরা। কিন্তু মৃণালকে দেখতে গিয়েই হঠাৎ ওরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর বহু চেষ্টা করেও ওদের পাত্তা পাওয়া গেল না।

উৎপল জিজ্ঞেস করল, কি ভানুসিং এরা কি তোমার সেই সায়েবরাই নাকি?

—ভানুসিং মাথা হেলিয়ে বলল, আর কারা হবে বাবু। দু জন শুধু নেই দেখছি। এদের মধ্যে আছে একজন শেরপা আরেকজন ওদের সর্দার।

—কিন্তু ওরা কি নন্দাখাত একসপিডিশনে এসেছে। মৃণাল জিজ্ঞেস করল।

—তা কি করে হয় বাবু। ভানুসিং-এর মুখ থমথমে—একসপিডিশন কি এভাবে হয় বাবু। তবে ওরা নন্দাখাতে হঠাৎ চড়তে গেল কেন বুঝতে পারছি না। দাল মে কুছ কালাহোগা। আমাকে ওরা বলেছিল জিরো পয়েন্টের ধারে কাছেই থাকবে।

উৎপল চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, হুঁ ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে। নন্দাখাতেই তো ওই মেয়েটা মারা গেছে যার ছবি ওদের সঙ্গে রয়েছে!

—শুধু তাই নয়। দীপক বলল, আমার মনে হয় এই ছবিটা হারিয়ে যাওয়ার জন্যই ওরা সেদিন ভানুসিং-এর ওপর এত চোট-পাট করেছে।

—কি হতে পারে? মৃণাল ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল। ভানুসিং তোমার কি মনে হয়?

—বুঝতে পারছি না বাবু। ভানুসিং-এর চেহারায় তখনো রহস্য ফুটে আছে। বিড়বিড় করে বলল, ওরা আমার কাছ থেকে নন্দাখাতের বেস ক্যাম্পটা কোথায় হয় একবার জেনেছে। এখন বুঝতে পারছি এই পাহাড়েই তাহলে ওদের ওঠার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেন? জরুর কিছু গোলমাল আছে।

—কিন্তু গোলমেলে হলেও এখন আমরা কি করতে পারি?

মৃণালের প্রশ্ন শুনে সবাই ভাবল, তাই তো এ মুহূর্তে ওদের করার কি আছে। ওই দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে কিছু জানার তো উপায় নেই। তা ছাড়া ওরা ওদিকে যাবেই বা কেন। কি না কি সঠিক কিছুই ওরা জানে না।

উৎপল শেষ মুহূর্তে বলল, ঠিক আছে চল। আমরা ভারারি গিয়ে পুলিশ থানায় মেয়েটির ছবিটা জমা দিয়ে সব বলে যাব। যা এদের সম্বন্ধে জেনেছি আর যা দেখলাম।

কথাটা সবারই মনঃপুত হল। ওখানে আর না দাঁড়িয়ে এবার এগিয়ে গেল সবাই।

ডাক্তারবাবু ও মুখিয়াজী যথাসময়েই বেরিয়েছিলেন খাতি থেকে। ওঁরা দোয়ালীর পথেই এগোচ্ছিলেন। পিণ্ডারির ধারে ধারে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার গিয়ে সেই কাঠের পুল পেরিয়ে পিণ্ডারির এ পারে এলেন ওরা। তারপর একটু ওপরে উঠে দোয়ালীর পথ ছেড়ে বাঁ দিকে ঘুরলেন। এবার ছোট্ট সরু পথ। আরো ওপরে উঠতে হল ওদের। এদিকের পাহাড়ের প্রায় শিখরে উঠে পথ আবার ওপাশে নেমে গেছে। ওদিকে ঘন জঙ্গল। ঝোঁপ-ঝাড় হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগোতে হল। কিছু দূর গিয়ে সরু পথটুকুর চিহ্নও মুছে গেল। মুখিয়াজীকে অনুসরণ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তা এবার আরো দুর্গম। পাশে গভীর খাদ। খুব সাবধানে ডানদিকের খাড়া দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে হচ্ছে। আবার ওপরে উঠতে শুরু করলেন ওরা।

এভাবে আরো তিন কিলোমিটার ওঠা-নামা করে একটা ঝরণার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন মুখিয়াজী।

ডাক্তারবাবু তখন হাঁপাচ্ছিলেন।—আর কতদূর মুখিয়াজী?

—এসে গেছি। এবার সামান্য পথ। মুখিয়াজী ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে এটুকুই খুব কঠিন। একটু জিরিয়ে নিন তারপর উঠছি।

যেখানে ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তার উত্তর দিকে পাহাড়ের সারি। পশ্চিমেও তাই। দু দিকেই তুষার শৃঙ্গ ছড়িয়ে আছে। ওদের ঠিক উল্টো দিকে পাহাড়ের তুষার-চুড়োয় রোদ ঝলমল করছে। মাঝখানে বুক-কাঁপানো

গভীর খাদ। পূব দিকে ওদের গা ঘেঁষে খাড়া পাহাড়। যে পাহাড়ের শিখর থেকে ঝরণার জল গড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ তুষার গলা জল।

—চলুন বাবুজী। কিছুক্ষণ পরে মুখিয়াজী তৎপর হয়ে বললেন, এবার আপনি আগে চলুন। খাড়া উঠতে হবে তো। আপনার পা পিছলে গেলে আমি পেছন থেকে ধরে নেব। বলে যে পথে উঠতে নির্দেশ দিলেন তিনি তার উচ্চতা দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। পথটা ঝরণার প্রায় সমান্তরাল ওপরে উঠে গেছে। তবে পা রাখার ধাপের মত কিছু উচু নীচু জায়গা আছে। ওঠা হয়ত যাবে কিন্তু খুব সাবধানে দু হাত দিয়ে ওপরের জমিটুকু ধরে ধরে।

তাই উঠলেন ডাক্তারবাবু। ঠিক তার সঙ্গে-সঙ্গেই মুখিয়াজীও উঠলেন। ঝরণার জলের মিহি কণাগুলো মাঝে মাঝ লাগছে এসে গায়ে। পথটাও তাই কোথাও-কোথাও স্যাতঁস্যাতেঁ। অর্থাৎ আরো বিপজ্জনক। পা যখন-তখন পিছলে যেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখিয়াজীর কাছ থেকে সাহস ও সাহায্য পেয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনো গেল। ওই খাড়া পাহাড়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উঁচুতে হল একটা ঘাস জমি। সেই জমির ওপর উঠে সামনের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ডাক্তার বাবু। অজস্র তুষার শৃঙ্গ উঁকি মারছে সেদিক থেকে। একেবারে পেছনে দেখা যাচ্ছে রজত-শুভ্র সেই নন্দাখাত ও তার দুই সঙ্গী।

—আসুন বাবুজী। মুখিয়াজীর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। তারপর তাঁর পেছন পেছন চলতে শুরু করলেন। ঘাসের জমিটা শুরু হয়েছে পাহাড়ের এক বিশাল প্রস্তর ময় দেয়াল থেকে। সেই দেয়ালের ডান দিক বেয়ে ঝরণার জল গড়িয়ে পড়ছে। এত ওপরে উঠেও মুখ তুলে তার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল না। মুখিয়াজী সেই শিলায়িত দেয়ালের কাছে এসে ঘাস জমিটার একেবারে উল্টোদিকে এলেন। সেখানে পাহাড় আবার হঠাৎ নেমে গেছে নীচের অতল গিরিখাতে। এই গিরিখাত আর দেয়ালের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ চলে গেছে ওপাশে। ওপাশটা এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না খাড়া পাহাড়ের উল্টোদিক ওটা।

সরু পথটার মুখে এসে ডাক্তারবাবু দেখলেন একটা পাথরের বেদির ওপর তামার থালায় কোশা কুশি ও একটি শঙ্খ রাখা। পাশে কিছু ফুল ও চন্দন। মুখিয়াজী ভক্তিভরে সেই চন্দন আঙ্গুলে নিয়ে নিজের কপালে ও ডাক্তারবাবুর

কপালে পরালেন। তারপর ফুলের ওপর ডান হাতের গণ্ডুষ রেখে কি যেন মন্ত্র পড়লেন বিড়-বিড় করে। কিছু ফুল কপালে নিয়ে ঠেকালেন। ডাক্তারবাবুর কপালেও ছুইঁয়ে সেই ফুল গিরিখাতের কাছে গিয়ে ছুঁড়ে দিলেন অতল গহ্বরে। তারপর ফিরে এসে শঙ্খটা হাতে তুলে মুখের কাছে নিয়ে ফুঁকলেন জোরে। পর-পর তিন বার। নিস্তব্ধ নির্জন অঞ্চলটা শঙ্খনিনাদে মন্দ্রিত হয়ে উঠল। মীড়ের ছন্দের মত তিনটে প্রতিধ্বনিও ভেসে এল বাতাসে।

শঙ্খটা রেখে মুখিয়াজী ডাক্তার বাবুকে ফিস-ফিস করে বললেন—এবার আসবেন সুন্দরবাবা।

ডাক্তারবাবু উদগ্রীব কণ্ঠে একই স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, সুন্দরবাবার গুহাটা কোথায়?

—ওপাশে। হাতের ইশারায় পাহাড়ের উল্টো দিকটা দেখালেন মুখিয়াজী। ওদিকটা আমরা যেতে পারি না। সুন্দরবাবা এই শঙ্খের শব্দ শুনে এখানে এসে আমাদের দর্শন দেন।

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন সেই পথটার দিকে।

একটু পরেই ওপাশ থেকে খড়মের শব্দ ভেসে এল। মুখিয়াজী একটু পিছিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপরেই সেই সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি।

এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী। তীক্ষ্ণ নাক। উজ্জ্বল দুটো চোখ। মাথায় উঁচু খোপার মত করে বাঁধা জটা। মুখেও জট পাকানো দীর্ঘ পিঙ্গল দাড়ি। সুঠাম দেহ। এই কনকনে ঠাণ্ডায় সেই দেহের ওপর বস্ত্রের বাহার দেখে আঁৎকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। কোমর থেকে জানু দেশের অর্ধেক পর্যন্ত এক খণ্ড বল্কল জড়ানো। তা ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর বস্ত্রহীন। নগ্ন বুক। নগ্ন পাদদেশ। মুখিয়াজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন তাকে। দেখা দেখি ডাক্তার-বাবুও করলেন। সুন্দরবাবা দূর থেকে হেসে আশীর্বাদ দিলেন তাদের।

—বাবাজী। মুখিয়াজী উঠে হাত জোড় করে বললেন, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ে এসেছি ডাক্তারবাবুকে। ইনি কাল বিকেলেই খাতিতে এসে পৌঁছেছেন।

সুন্দরবাবা ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন। তাঁর হাসিতে

সম্মোহনী যাদু আছে। ডাক্তারবাবুও শ্রদ্ধায় নত হয়ে দাঁড়ালেন
র সামনে।

—তোমরা বস। বিশ্রাম কর। আমি আসছি। সুন্দরবাবার ভরাট
। কথা গুলো বলে আবার তিনি খড়মের শব্দ করে সরু পথ দিয়ে চলে
লেন ওপারে।

মুখিয়াজী ডাক্তার বাবুর সঙ্গে নীচে ঘাসের ওপর বসলেন। সুন্দরবাবাকে
য়েই কিছুক্ষণ কথা হল দুজনের মধ্যে। তারপর আবার এলেন সুন্দরবাবা।
রা উঠে দাঁড়ালেন খড়মের শব্দ শুনে।

—বৎস তোমার কথা আমি এঁদের মুখে অনেক আগেই শুনেছি।
দরবাবা ডাক্তার বাবুর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে বললেন, তুমি নাকি এই
ঞ্চলে প্রতি বছর একবার করে আসছ। এই পাহাড়ী মানুষদের প্রতি
মার অকপট সেবার কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

—এ আর এমন কি বাবাজী। ডাক্তারবাবু হাত জোড় করে বিনয়ের স্বরে
লেন, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে মাত্র একটি কি দুটি দিন এদের জন্য ব্যয়
। একে আর সেবা বলে লজ্জা দেবেন না।

—তোমার একটি দিন। কিন্তু সেটাই এদের কাছে অনেক বড়।
দরবাবা ভাব গম্ভীর স্বরে বললেন, রোগ হলে এদের যে দেখার কেউ নেই
বা। আমি জানি এরা কত আগ্রহে তোমার আসার জন্য পথ চেয়ে
স থাকে।

—কিন্তু বাবাজী। ডাক্তারবাবু বললেন আমি আসি এক দিনের জন্যে,
র আপনি যে সারা বছর এদের দেখাশোনা করেন। সে কথাও আমি
নছি।

—আমার ক্ষমতা সীমিত বৎস। সুন্দরবাবা গম্ভীর হয়ে বললেন এবার।
মার গুরুদেব এই বিদ্যা কিছুটা শিখিয়ে গিয়েছিলেন আমায়। কিন্তু এখন
র সাধনায় লিপ্ত হয়ে সব ভুলে বসে আছি। তা না হলে আজ তোমায়
য়োজন হত আমার?

—বলুন কি প্রয়োজনে ডেকেছেন আমায়? ডাক্তারবাবু প্রশ্নসূচক
ষ্টিতে তাকালেন।

সুন্দরবাবা একটু ইতস্তত করে মুখিয়াজীকে বললেন, বিক্রম তোমাকে

একটু বসতে হবে। আমি বিশেষ প্রয়োজনে একে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি

মুখিয়াজী প্রথমে বেশ থতমত খেয়ে গেলেন। গত ন বছর ধরে এখা আসছেন তিনি। এখন পর্যন্ত সুন্দরবাবা কাউকেই ওই পথের ওপা নিয়ে যান নি।

থতমত ভাবটা কাটিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন—হ্যাঁ, বাবাজী আ বসে আছি এখানে। আপনি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যান।

ডাক্তারবাবুও বিস্মিত হলেন। উদগ্রীব দৃষ্টি নিয়ে সুন্দরবাবাকে অনুস করলেন তিনি।

রাস্তাটা বাঁক নিয়েই একটু ঘুরে পাহাড়ের ওপারে চলে গেছে। ওপা একটুকরো সমতল জমি। তবে তার তিনদিকে শিলাখণ্ডের ছড়াছড়ি। আ একদিকে গভীর গিরিখাত। সূর্যের আড়ালে বলে এ পাশটা বেশ থমথমে ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটু এগুতেই ডান দিকে গুহার দেখা পাও গেল। ভেতরে অন্ধকার। দুরু দুরু বুকে আর দুপা যেতেই ডাক্তাবাবু থম দাঁড়িয়ে পড়লেন। এতক্ষণ তিনি গুহার ওপরের অংশটা দেখছিলেন। এবা তার দৃষ্টি গেল নীচে।

ডাক্তারবাবু দেখলেন গুহার একটু ভেতরে দুটো পাথরের পায়ার ও গাছের ডাল-পালা দিয়ে তৈরী একটি উঁচু শয্যা। সেই শয্যায় মোটা ক গায়ে কেউ শুয়ে আছে।

—এস বাবা। সুন্দরবাবা ডাক্তারবাবুকে গুহার ভেতরে আস বললেন।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন ভেতরে। শয্যার একেবা কাছাকাছি গিয়ে দৃষ্টি আরো বিস্ফারিত হল তাঁর। যে শুয়ে আছে সে পু নয়—একটি মেয়ে। এবং সে বিদেশী। তার শীর্ণকায় হাড়জিরজিরে মুখখা দেখে বয়েস বলার কোন উপায় নেই। তবে মনে হল তিরিশ-পঁয়ত্রিশে নীচেই হবে।

—আমি এর জন্যই তোমার খোঁজ করছি, বৎস। সুন্দরবাবা শয্যাশায়িনী দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আমি একে অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি আর পারব কিনা বুঝতে পারছি না। তুমি এর দায়িত্ব নাও।

—কিন্তু এ কে বাবাজী?

—তুমি একে যা দেখছ। এ আমার কাছেও তাই। এর পরিচয় আমি
ছু জানি না। একে আমি আজ থেকে চৌদ্দদিন আগে নন্দাখাতের তলা
কে কুড়িয়ে পেয়েছি।

—নন্দাখাত! কিন্তু সে তো এখান থেকে অনেক দূর!

—অনেক দূর নয়। এখান থেকে মাত্র তিন-চার ক্রোশ। আমি প্রতি
র্ণিমার ভোরে নন্দাদেবী দর্শন করে সূর্যপ্রণাম করতে যাই সেখানে। সুন্দর-
বা বললেন, এবার সূর্যপ্রণাম সেরে যখন ফিরছিলাম তখন নন্দাখাতের তলায়
ারের এক ফাটলের মধ্যে একে পড়ে থাকতে দেখি। এর সঙ্গে আরো
জন ছিল। আর একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ। তবে তারা তখন মৃত।
শ্চয়ই সারা রাত ওরা পড়েছিল সেখানে। কারণ প্রত্যেকেরই দেহের ওপর
ল তুষারের পুরু আবরণ। একমাত্র এই মেয়েটির মধ্যে প্রাণের কিঞ্চিত
ভাস পেয়ে সেই তুষার-সমাধি থেকে বার করলাম ওকে। তখন
সম্পূর্ণ অচেতন। পা দুটোও তুষার-ক্ষতে জর্জরিত। মৃতপ্রায় মেয়েটিকে
রপর কাঁধে করে নিয়ে এলাম এখানে। সেই থেকে আজ অব্দি ওর আমি
কিৎসা করেছি। কিন্তু তোমায় যা বললাম, আমার ক্ষমতা সীমিত। ওর
ীরের পচন আমি রোধ করেছি, প্রাণও হয়তো কিছুটা সবল করতে
রেছি। কিন্তু ওর দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি ও বাকশক্তি ফিরিয়ে আনতে
রিনি। পারিনি ওর মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার করতে। তুমি এখন ওকে
ীক্ষা করে দেখবে?

ডাক্তারবাবু স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন সুন্দরবাবার কথাগুলো। পুরো
াটাই তার কাছে শিহরণময়। যা এখন তিনি দেখছেন যা শুনলেন। কিন্তু
মুহূর্তে তাঁর খুব দুঃখ হল। ডাক্তারী সরঞ্জাম কিছুই তিনি আনেননি
। একবার আনার কথা ভেবেছিলেন বটে কিন্তু সুন্দবাবার বনৌষধির
রণ শুনে আনার আর প্রয়োজন বোধ করেন নি। অতএব এখন খালি
তই যতটা সম্ভব দেখতে হবে একে।

ডাক্তাবাবু ঝুঁকে মেয়েটির গলার ওপর থেকে কম্বলটা তুললেন একটু।
মেই যা নজরে পড়ল সেটা হল মেয়েটির গলায় একটা চকচকে ধাতুর হার।
র সঙ্গে ঝুলছে পবিত্র ক্রুশের একটা লকেট। এত বড় লকেট মেয়েটির
হে বড় বেমানানো। দেহ তো নয় যেন অস্থি-চর্মসার। রগ বেরোনো

গলা থেকে শুরু করে সারা গায়ে চন্দনের মত কিছু প্রলেপ মাখানো। তি
খুব সাবধানে কম্বলটা আরেকটু তুলে মেয়েটির ডান হাতটা বের করলেন
সেই লিকলিকে সরু হাতও প্রলেপ লিপ্ত। আলগা ভাবে ধরে তারপর না
পরীক্ষা করলেন, ক্ষীণ স্পন্দন। বুকের ক্রশটা সরিয়ে কান পেতে দেখলেন
শ্লেষ্মা নেই কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে ভেতরে। চোখের কোল সরিয়ে দেখলে
ঘোলাটে রক্তহীন। জিভ অসাড় বিবর্ণ। আরো প্রয়োজনীয় পরী
নিরীক্ষার পর ক্রশটা যথাস্থানে রেখে কম্বলটা ঢেকে দিলেন তিনি।

—গলার ওই হারটা ইচ্ছে করেই সরাইনি। সুন্দরবাবা এবার বলে
কারণ আমি জানি ওর সঙ্গে ঝুলছে খ্রীষ্ট-ধর্মের পবিত্র-প্রতীক। কে জানে এ
প্রতীকের জন্যই হয়ত মেয়েটি নিশ্চিন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে।

—তা হতে পারে। ডাক্তারবাবু গভীর শ্রদ্ধা মিশ্রিত স্বরে বললেন, কি
বাবাজী আপনার কৃতিত্বও কম নয়। মেয়েটি যে অনাহার আর আশ্রয়হী
অবস্থায় তুষারে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে সেটা সুস্পষ্ট। সেই মেয়ের বুকের অব
এর মধ্যেই এত স্বচ্ছ হতে পারে না। আপনার বনৌষধি আমার কা
বিস্ময়কর মনে হচ্ছে।

—না, না। এতেই বিস্মর প্রকাশ করো না বাবা। সুন্দরবাবা ক্ষো
সঙ্গে বললেন, আমি কিছুই করিনি। আমার গুরুদেবের যদি হাত পড়ত এ
সম্পূর্ণ সুস্থ করে এর নিজের পায়েই বাড়ি পাঠাতেন তিনি।

ডাক্তারবাবু এবার মেয়েটির পায়ের দিকে গিয়ে কম্বল তুলে দেখলেন
পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোনো গাছের ছাল লাগিয়ে শেকড় দি
শক্ত করে বাঁধা। ছালের উপর আঠার মত কালো-কালো একটা প্রলে
লাগানো। সেই প্রলেপ ভেতরেও আছে বলে মনে হল। পা দুটো দেখ
এখন ঠিক কলকাতা মিউজিয়ামে দেখা মমির তলদেশের মত। ডাক্তারব
ঝুঁকে সেই শেকড় আর ছালের ফাঁক দিয়ে মেয়েটির ডান পায়ের বু
আঙ্গুলটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। যতই সেই পরীক্ষা গভীর থে
গভীরতর হল ডাক্তারবাবুর মগজের গ্রন্থিগুলো অসীম বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠ
আশ্চর্য, এ তো অবিশ্বাস্য! এ কি সম্ভব? পা দুটোয় তুষার ক্ষতে যে প
ধরেছিল সেটা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু সেই পচন থেকে প্রায় সম্প
আরোগ্য লাভ করেছে মেয়েটি। ডাক্তারবাবু জানেন, শরীরে এই পচন একব

ধরে গেলে সেই অংশ কেটে বাদ না দিলে শরীরের অন্যান্য অংশেও তা ছড়িয়ে যায়। অর্থাৎ যার শেষ পরিণতি রোগীর মৃত্যু। এই মেয়েটি তাদের চিকিৎসাধীনে এলে প্রথমে তাই করতেন তারা। হয়ত এর হাঁটু অব্দিই কেটে বাদ দিতে হত। কিন্তু এক্ষেত্রে বনৌষধি একেবারে অলৌকিক কাজ করেছে। পচন রোধ করে একেবারে তাকে নির্মূল করা! না, তাদের বিজ্ঞান এখনো এতদূর এগোয়নি।

ডাক্তারবাবু অভিভূত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। শেষে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—বাবাজী এই মেয়েটির দায়িত্ব আপনি আমায় দিতে চাইছেন? একটা কথা শুধু জেনে রাখুন, যে অবস্থায় একে আপনি পেয়েছেন, আমাদের অতি-আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম থাকলেও সেই অবস্থা থেকে একে আমরা বাঁচাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ আপনার হাতেই হবে।

—না, না বৎস। সুন্দরবাবা দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আমি এই মেয়েটিকে এখানে আনার পর থেকে এতদিন একে সম্পূর্ণ সুস্থ করার ঘোরেই মত্ত ছিলাম। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এই মেয়েটি যে অবস্থায় এই অঞ্চলে এসেছে ঠিক সে অবস্থায় একে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু পারলাম না বহু চেষ্টা করেও পারলাম না। ওকে এখন তুমি যতটুকু সুস্থ দেখছ ওর এইটুকু প্রতিকার আমি সাতদিন আগেই করতে পেরেছি। কিন্তু তার পর আর এগোতে পারছি না। যেটা খুবই চিন্তার বিষয়। অবস্থা ওর সাতদিন থেকে একই আছে। আর সেইজন্য সাতদিন থেকে আমি তোমার খোঁজ করছি। ওকে তো যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না। তুমি ওর দায়িত্ব নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর।

ডাক্তারবাবু একটু ভাবলেন। দায়িত্ব নেওয়া মানে একেনিজের তত্ত্বাবধানে বাগেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া। কিন্তু এই দুর্গম জায়গা থেকে একে নামাবেন কি করে? এর জন্য লোকবলের প্রয়োজন। ষ্ট্রেচারের প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—বাবাজী এর কথা কি আপনি আর কাউকে বলেন নি?

—না। কাকে বলব?

—কারো মারফত ভাঁরারি কিংবা বাগেশ্বরের সরকারী মহলে খবরটা পাঠাতে পারতেন।

—না, না। সুন্দরবাবা সজোরে মাথা ঘোরালেন, ওসব করে এখানে আমি লোক ডেকে আনতে চাই না। গতবছর এরকম একটা অনর্থক ঝামেলার জন্য আমাকে এই বাসস্থান ত্যাগ করতে হয়েছিল।

—তাহলে নন্দাখাতের তলায় ওই মৃত দুটি ছেলেমেয়ের কথাও কেউ জানে না? কাউকেই কিছু বলেন নি আপনি?

—না, আমি এ নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলিনি। বলে লাভ? ওরা তো মৃত। বললে আর প্রাণ কি ফিরে পেত ওরা? যার মধ্যে প্রাণের আশা ছিল তাকে আমি তুলে এনেছি। তাকে আরো প্রাণবন্ত করে ফিরিয়েও দিচ্ছি তোমাদের মধ্যে।

ডাক্তারবাবু বুঝলেন, এই সন্ন্যাসী বাইরের জগতের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে সবের তোয়াক্কাও করেন না। অবশ্য সংসার ত্যাগী মানুষ সভ্য সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা জেনে করবেনই বা কি। তিনি যে এরকম একটি মুমূর্ষু মেয়েকে এত যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছেন এটাই তাঁর বড় মহত্ব। এখন ডাক্তারবাবুকে করতে হবে তার কর্তব্য। তিনি একটু চিন্তা করে মুখ তুলে বললেন, ঠিক আছে বাবাজী। একে আমি নিয়ে যাব। তবে এরকম দুর্গম স্থান থেকে এই ক্ষীণ দুর্বল মেয়েটিকে নীচে নামানোর জন্য একটা মজবুত শয্যা ও দু একজন বেশি লোকের প্রয়োজন। আমি সব ব্যবস্থা করে না হয় কাল কি পরশু আসছি। আপনি এই দুটো দিন অন্তত ওকে যে ভাবে রেখেছেন সে ভাবেই রাখুন।

—বেশ তাই করো। সুন্দরবাবা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আপাতত রাখার মধ্যে একে আমায় রোজ এভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করানো ছাড়া খাওয়াতে হয় মৃত সঞ্জীবনী পাতার রস। তবে ব্যাপার কি জান এই সব করতে করতে মেয়েটির মায়ায় পড়ে যাচ্ছি আমি। সন্ন্যাসী জীবনে এই মায়া হল বিরাট বিঘ্ন স্বরূপ। তুমি বাবা পরশুর দেরী আর করো না। একে তোমার হাতে সমর্পণ করে আমি নিজেও মুক্ত হতে চাই।

—আসব আমি বাবাজী। ডাক্তারবাবু জোর গলায় বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

—তোমার মঙ্গল হোক বাবা। চলো এখন তোমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। সুন্দরবাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন। এর পর রওনা হলে পথেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সুন্দরবাবার পেছন পেছন আবার সেই সরু পথটার দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। কয়েক পা গিয়েই হঠাৎ তিনি বললেন, একটা কথা বাবাজী।

সুন্দরবাবা থামলেন।

তিনি ঘুরে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবু বললেন, মেয়েটিকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য মুখিয়াজীকে অন্তত সব কথা বলতে হবে।

—হ্যাঁ এখন তুমি বলতে পার। সুন্দরবাবা আবার হাঁটা শুরু করে বললেন। আমি ওর চিকিৎসা নিভৃতে করার জন্যই কাউকে কিছু বলিনি। অনর্থক কৌতূহল বাড়িয়ে কি লাভ। তা ছাড়া প্রয়োজনও কিছু হয় নি। এখন প্রয়োজন হয়েছে তাই বলেছি। তুমি ওকে স্থানান্তরিত করার জন্য যা করতে হবে করো।

গুহা থেকে ঝরণার শেষ মাথা অব্দি নামার কঠিন পথটুকু মুখিয়াজীকে কিছু বললেন না ডাক্তারবাবু। নীচে নেমে ঝরণা পেরিয়ে তারপর শুরু করলেন। গুহায় গিয়ে যা দেখলেন আর যা শুনলেন সবই তিনি বললেন।

—কি বললেন, নন্দাখাত পর্বতের তলায়—! শুনতে শুনতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন মুখিয়াজী। বিড়বিড় করে বললেন, দুটি মেয়ে একটি ছেলে! তার মানে এরা সেই অভিযাত্রী দলের ছেলেমেয়েরা। যাদের লাশ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—কোন অভিযাত্রী দল? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন?

—ওরা আমেরিকা থেকে এসেছিল দিন পনেরো আগে। তারপর সেই ঘটনা সম্বন্ধে যতটুকু তিনি জানতেন সব বললেন ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তারবাবুও শুনে থ।—তাই নাকি! তাহলে পাঁচজনের মধ্যে এই তিনজন বেঁচেছিল তখন!

—এখন তো দেখছি তাই। মুখিয়াজী কপাল কুঁচকে বললেন, তার মানে

এরা তখন বরফের স্তূপের নীচে না পড়ে পেছন দিকে বোধহয় আটকে গিয়েছিল। পরে রাস্তা খুঁজে পেয়ে নন্দাখাতের তরাই পর্যন্ত নেমে এসেছিল। যাই হোক, তারপর— ?

তারপর বাকিটুকু বললেন ডাক্তারবাবু। অর্থাৎ মেয়েটিকে কি ভাবে বাঁচালেন সুন্দরবাবা ও তার অবস্থা এখন কি রকম। ডাক্তারবাবুকে কি উদ্দেশ্যে ডেকেছেন তিনি তাও খুলে বললেন।

—বুঝেছি। মুখিয়াজী মৃদু হেসে চমৎকৃত হওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, এতদিনে পরিষ্কার হল, সুন্দরবাবা কয়েকদিন আগে আমার কাছ থেকে একটা মোটা কম্বল চেয়ে নিয়েছিলেন কেন। আমি তখন বেশ তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ বাবাজী এসব কখনো ব্যবহার করেন না।

তারপর ওরা আলোচনা করতে করতে এগোলো। কি ভাবে মেয়েটিকে ওখান থেকে নামানো হবে ও কি ভাবে তাকে ভারারি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে তাই নিয়ে। মুখিয়াজী এই আলোচনার মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন, খাতিতে গিয়ে কালই সব ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। যাতে পরশু দিন মেয়েটিকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

খাতিতে ডাক্তারবাবুদের ফেরার আগে বিকেল চারটে নাগাদ দুটো দল দুদিক থেকে এসে পৌঁছল। প্রথম দলের সৌরভরা মোটামুটি একটা রেকর্ড করে ফেলেছে। ওরা ছাঙ্গোছ বেস ক্যাম্প থেকে সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে টানা হেঁটে দোয়ালীতে লাঞ্চ খেয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে তিনটে চল্লিশে। যদিও এই পথের বেশীর ভাগটাই নামা। তবু পাহাড়ী পথ। সমান তো নয়। তারপর কিছুটা অংশ বরফে ঢাকা। এইটুকু সময়ে এই দীর্ঘ দুর্গম পথ হেঁটে আসা কৃতিত্বের কথাই। ওদের আধঘন্টা পর ঢাকুরীর দিক থেকে এল প্রেমনাথ আর লোমী। সঙ্গে দুজন কুলী।

এরাও আজ কম হাঁটেনি। গতকাল লখনউ থেকে ওরা আলমোড়া পর্যন্ত একটা এমবাসাডারে এসে তারপর জীপ নিয়ে ভারারি পেরিয়ে সোজা এসেছিল লোহারক্ষেতের অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত। রাতটা লোহারক্ষেতে কাটিয়ে আজ ওরা খাতি চলে এল। অবশ্য ট্রেকাররা সাধারণত একদিনেই এই পথ সমাধা করে। কিন্তু ওরা ট্রেকার নয়। এমন কি সমতলেও এতটা হাঁটেনি

কখনো। তাই বেশ ধকল গেছে শরীরে। কি করবে? এমন গাড্ডায় পড়েছে বাঁচতে হলে হাঁটতেই হবে। কারণ আটই জুনের আর দেরী নেই।

কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে দুজন বাংলোতে ঢুকে প্রথম ধাক্কা খেল থাকার কোনো ঘর না পেয়ে। বাংলোয় দুটো মাত্র ঘর। তার মধ্যে একটা কাল থেকেই ডাক্তারবাবুর দখলে। আরেকটায় সৌরভরা একটু আগে উঠেছে। তারা অবশ্য পাহাড়ী কেতা অনুযায়ী প্রেমনাথকে বলেছে, ইচ্ছে করলে দুজন ওদের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু প্রেমনাথ আর লোমী দুজনেরই ধাত আলাদা। সভ্য মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার পাত্র নয় ওরা। তাই ওদের কথায় কোনো আমল না দিয়ে দুজন বাংলোর পাশে রেষ্টুরেণ্টে একটা ঘর যোগাড় করে নিল।

ঘরটা সরকারী নয়। রেষ্টুরেণ্টের মালিকের। নতুন তৈরী বলে ঘরে আসবাব বলতে শুধু দুটো মাত্র খাট। চেয়ার টেবিল কিছুই নেই। প্রেমনাথ ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ঢুকে একটা খাটে সটান শুয়ে পড়ল। লোমী বসল আরেকটায়। ওরও অবস্থা তখন কাহিল। ক্লান্তিতে আড়ষ্ট পা। জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে গাল ঝুলে পড়েছে। চোখও যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে ভেতর থেকে। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে প্রেমনাথকে বলল, "একটা চেয়ার হবে না? এ যে দেখছি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মত হাল।

কুলী দুটো তখন মালপত্র রাখছে ঘরের ভেতর। প্রেমনাথ ওদেরই বলল, এই যা, একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে আয় সায়েবের জন্য।

দুজন বেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চেয়ার নিয়ে এল। আসলে সৌরভদের কাছ থেকে ওটা চেয়ে এনেছে। তবে সে কথা আর বলল না। দু সায়েবের খাবার-দাবারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল দুজন।

লোমী খাট থেকে উঠে চেয়ারে বসল আয়েস করে। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। দীর্ঘ একটা টান দিয়ে ঘাড়টা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে দিল আস্তে আস্তে। যাক্, অমানুষিক কষ্ট হলেও এদ্দূর এসে নিশ্চিন্ত লাগছে মন। আজ পাঁচ তারিখ। গত পরশুই দিল্লী থেকে রওনা হয়ে আজকের মধ্যে এরকম এক দুর্গম জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। ওফ্ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ওরা। এখন এরকম কষ্ট করেই না হয় হাঁটবে কালকের দিনটা। তারপর পরশু দুপুরের মধ্যেই নিশ্চয়ই নন্দাখাতের বেস ক্যাম্প। মোদ্দা

কথা আটই জুন নন্দাখাত ওদের পুরোপুরি ফাঁকা করে দিতেই হবে। তা না হলে কপালে যা দুর্ভোগ আছে ভাবতে গেলেও হিম হয়ে আসে শরীর।

রেষ্টুরেন্ট থেকে অর্ডার দেওয়া চা চলে এল এবার। সঙ্গে ডবল ডিমের ওমলেট। লোমী সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। প্রেমনাথও উঠল খাট থেকে। ক্ষিদে দুজনেরই পেটে প্রচুর। হাত বাড়িয়ে যে যার খাবার নিয়ে শুরু করে দিল খাওয়া।

চা শেষ হবার মিনিট খানেক পর ঘরের দরজায় হঠাৎ দুটো মূর্তি দেখে তাকাল দুজন। দীপক আর উৎপল। ছেলে দুটো এমনিতেই আলাপী। তারপর এই পথে একজন বিদেশীকে দেখে আরো উৎসাহী হয়ে এসেছে কথা বলতে।

—ভেতরে আসতে পারি? দীপক চৌকাঠে এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল।

লোমী অস্বস্তি বোধ করল। প্রেমনাথ আবার তাকাল ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে। তবে এখন উপায় নেই ওরা প্রায় ঢুকে পড়েছে। তাই গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, এস।

ওরা ঘরের ভেতরে পা রেখে চারদিকে তাকাল। উৎপল বলল এবার—ঘরটা তো মন্দ নয়। তবে খাট ছাড়া কিছু নেই এই যা। আপনাদের কি আরেকটা চেয়ার দরকার? নিয়ে আসব?

প্রেমনাথ খাটের ওপর নড়ে চড়ে বসে বলল—এই চেয়ারটা আপনাদের?

—এই পাহাড়ে আমাদের বলে কিছু নেই—ক্ষমা করবেন কি নাম আপনার? উল্টো দিকের খাটটায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল উৎপল।

—আমার নাম জীবন ত্রিবেদী। বলা বাহুল্য অন্য নামই বলল প্রেমনাথ।

—আর আপনি? উৎপল লোমীর দিকে ঘুরল।

লোমী না হেসেই বলল—পিটার মাইক।

—কোথথেকে আসছেন?

—কানাডা।

এভাবে আরো কয়েকটা কথা হল চারজনের মধ্যে। এই ট্রেকিং নিয়ে, পাহাড় নিয়ে, রাস্তার কষ্ট নিয়ে। লোমী বিশেষ কথা বলছিল না। যা টুকটাক বলছিল প্রেমনাথ। সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে।

দীপক হঠাৎ বলল, আপনাদের এখানে ঘর পেতে অসুবিধে হল। তবে

এর পর আর হবে না। কারণ আজ ফুরকিয়াতে একটি দল মাত্র দেখলাম। তারা কালই নেমে আসবে। দোয়ালী ফুরকিয়া দুটো বাংলোই আপনারা ফাঁকা পাবেন।

—একেবারে ফাঁকা বলিস না। উৎপল মাঝখান থেকে বলে উঠল। যদি ও ব্যাটারা কাল নন্দাখাত থেকে নেমে আসে।

লোমীর জন্য ওরা ইংরেজীতেই কথা বলছিল। তা হলেও নন্দাখাত শব্দটা শুনে লোমী ও প্রেমনাথ দুজনেই কিঞ্চিত চমকে উঠল। ওরা একসঙ্গে তাকাল উৎপলের দিকে। প্রেমনাথ একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করল—নন্দাখাত! ওখানে কারা গেছে। কোনো অভিযাত্রী দল?

—আরে না না। দীপক হেসে বলল, গেছে চারটে উটকো লোক। অবশ্য ওর মধ্যে একজন শেরপা আছে। তবে কোনো অভিযানে আসেনি এরা। উদ্দেশ্য মনে হয় খুব বদ।

প্রেমনাথ আর লোমী মুহূর্তের জন্য তাকাল পরস্পরের দিকে। কি শুনছে ওরা এসব। তার মানে ডেভিডদের সঙ্গে কোথাও এদের সাক্ষাত হয়েছে। শুধু তাই নয় কিছু একটা গণ্ডগোলে ব্যাপারও ঘটেছে নিশ্চয়ই। তা নাহলে এদের এ ধরনের মন্তব্য—! প্রেমনাথ পুরো ব্যাপারটা জানার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ ভাল মানুষ সেজে বলল কি যে বলছ তোমরা। এরকম দুর্গম পথে উটকো লোক কখনো আসতে পারে। তা ছাড়া নন্দাখাতের মত বরফ ঢাকা পাহাড়ে বদ উদ্দেশ্য আবার কি থাকতে পারে?

—আসলে মিঃ ত্রিবেদী। উৎপল মৃদু হেসে বলল। আমরাও তাই ভেবে ছিলাম। কিন্তু পর পর ঘটনাগুলো যে ভাবে ঘটেছে তাতে সন্দেহের আর কিছু নেই যে নন্দাখাতে ওরা কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই গেছে।

—কি ঘটনা ঘটেছে? প্রেমনাথ প্রায় দম বন্ধ অবস্থায় প্রশ্নটা করল।

উৎপল আর দীপক তারপর ঢাকুরীতে ভানুসিং-এর সেই থলি নিতে যাওয়া থেকে শুরু করে মেয়েটির ছবি ও শেষ পর্যন্ত আজ সকালে দূরবীনে দেখা নন্দাখাতের ওপর দুজনের গতি বিধির সব কিছুই বলল ওদের। বলল একেবারে বিশদ ভাবেই। এই সব কথা অন্য কাউকে না বলে কি পারা যায়? বিশেষ করে এরা যখন বয়স্ক, এদের বলা উচিতও। কিন্তু ওদের এই কাহিনী শুনে প্রেমনাথ আর লোমীর অবস্থা তখন সঙ্গীন। বলে কি এরা!

এর মধ্যে মেয়েটির ছবি নিয়ে এত কাণ্ড ঘটে গেছে! সে ছবি আবার এদের কাছেই আছে এখন! মারাত্মক ঘটনা! লোমী আর থাকতে না পেরে আগুন দৃষ্টিতে তাকাল প্রেমনাথের দিকে। ওর ছেলেদের এই সাংঘাতিক অসাবধানতা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। একেবারে ছবি সুদ্ধ থলি ফেলে যাওয়া! বেয়াদবের দল সব! এদের দলে রেখেছে প্রেমনাথ। কিন্তু লোমীকে শিহরিত করার মত আরো কিছু কথা বাকী ছিল তখন। উৎপল সেটাই প্রেমনাথের দিকে তাকিয়ে বলল শেষে—ওই ছবিটা কার জানেন?

—কার? প্রেমনাথ ভেতর ভেতর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

—কয়েকদিন আগে একটা আমেরিকান অভিযাত্রী দল এসেছিল নন্দাখাত শৃঙ্গে আরোহণ করতে। তাদের পাঁচজন সদস্য নন্দাখাতে বরফের ধসে চাপা পড়ে মারা যায়। এই মেয়েটি সেই হতভাগ্যদের একজন।

প্রেমনাথের শিরদাঁড়াটা সাপের মত কিলবিল করে উঠল। আড়ষ্ট শরীরে উৎপলের চোখে চোখ রেখে বলল—তোমরা এ কথা জানলে কি করে?

দীপক উত্তরটা দিল—ভানুসিং বলেছে। ও নাকি ওই অভিযানে কুলি সর্দার ছিল। ছবিটা দেখে সে চিনতে পেরেছে।

—তাহলে বলুন। উৎপল আবার বলল। ওই ছবি ছিল ওদের সঙ্গে। আর সেই নন্দাখাতেই আজ সকালে ওদের আমরা ঘোরা-ফেরা করতে দেখলাম। ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয়?

—তাই আমরা ঠিক করেছি। দীপক বলল, ফেরার পথে এই ছবি ভারারি কিংবা বাগেশ্বর পুলিস থানায় জমা দিয়ে সব কথা ওদের বলে যাব।

লোমী ফোঁস-ফোঁস করে কয়েকটা অস্বস্তিকর নিঃশ্বাস ছাড়ল নাক দিয়ে। এ মুহূর্তে ওর গুলি করে মারতে ইচ্ছে করছে প্রেমনাথের এই তিনটে ছেলেকে! অবস্থা এখন যা চরম, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ভয় ভারতীয় পুলিসকে নয়। ভয় রজারকে। ঘটনা এভাবে গড়ালে তার কানে ব্যাপারটা যাবেই। তখন চরম দুর্ভোগ আছে লোমী আর পামেরোদের কপালে। অথচ লাশ খোঁজার ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয়ে যায় সে জন্যই ওর এভাবে এখানে ছুটে আসা।

প্রেমনাথেরও তখন খুব কাহিল অবস্থা। ডেভিডদের বেয়াদপি ওর মগজেও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে এ মুহূর্তে এ নিয়ে মাথা গরম বা

নার্ভাস হয়ে গেলে চলবে না। এই বিপজ্জনক ভবিতব্য ঘটনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা উপায় বের করতেই হবে। তাই অচিরেই নিজেকে শামলে নিল সে। একটু ভেবে নিয়ে তারপর সহজ কণ্ঠে ওদের বলল, তোমরা যা বলছ সেভাবে দেখলে অবশ্য ব্যাপারটা সন্দেহজনক বলে মনে হবে। কিন্তু ঘটনাটা আদৌ তা নয়। এরা কারা আমি এবার বুঝতে পেরেছি।

—কারা এরা? উৎপল তাকাল।

—আমার ভাই দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান মাউণ্টনিয়ারিং ফাউণ্ডেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মাধ্যক্ষ। প্রেমনাথ চোস্ত গলায় বলল, আসার সময় ওর কাছ থেকেই জানলাম। এই পথে নাকি একজন দক্ষ পর্বতারোহী শেরপাকে পাঠানো হয়েছে নন্দাখাতের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। ওকে পাঠিয়েছে আমেরিকান মাউণ্টনীয়ারিং ক্লাবের নির্দেশনুযায়ী ওদের দিল্লীর ট্র্যাভেলিং এজেণ্ট।

—তাই নাকি। দীপক সোজা হয়ে বসল খাটে।

উৎপল বলল, কিন্তু ভানু সিং আমাদের বলেছে শিগ্‌গিরি আমেরিকা থেকে নাকি একটা উদ্ধারকারী দল আসার কথা?

—হ্যাঁ। প্রেমনাথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তার আগেই এই শেরপাটিকে পাঠানো হয়েছে। এর রিপোর্ট পেয়ে তারপর ওরা প্রস্তুত হয়ে আসবে।

—তাহলে ওই ছবিটা—!

উৎপলকে থামিয়ে প্রেমনাথ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—ছবি কি তোমরা একটাই পেয়েছ?

—হ্যাঁ একটাই। দীপক উত্তর দিল।

—না। ওর সঙ্গে আরো দুটো ছবি থাকার কথা। প্রেমনাথ দৃঢ় গলায় বলল, তিনজন নিহত অভিযাত্রীর ছবি নিয়েই এসেছে ওরা। আমার ভাই তো আই.-এম.-এফের তরফ থেকে এই পুরো ব্যাপারটার খোঁজ খবর রাখছে। আমি সেই সুবাদেই যা জানি। তারপর একই পথে আমরা আসছি বলেই এদের সম্বন্ধে সে আমায় বিশদ ভাবে বলেছে। দিল্লীর এই ট্র্যাভেলিং এজেণ্ট এদের জন্যে আমাকে একটা চিঠিও দিয়েছে।

উৎপল এবার একটু থতমত খেয়ে বলল, কিন্তু আমরা একটা ছবিই পেয়েছি।

—তাহলে। প্রেমনাথ ভেবে বলল, ওটাই বোধহয় পড়ে গেছে থলি থেকে। ইস্ ছবিটা ওদের ফেরত দিয়ে দিলেই ভালো করতে তোমরা। কারণ আমি যদ্দুর জানি ওরা বোধহয় ওখানে একটু খোঁড়াখুড়িও করবে। বরফ তো গলছে। যদি সহজে কারো লাশ উদ্ধার হয়ে যায়। কার লাশ সেটা চিনতে হবে তো ছবি দেখে।

উৎপল আর দীপক দুজনেই তাকাল পরস্পরের দিকে। তাহলে এই ব্যাপার! তার মানে অনর্থক ওদের সন্দেহ। অবশ্য ভানুসিং বলেছিল বহু সাজ-সরঞ্জাম নাকি ওরা নিয়ে গেছে সঙ্গে করে। তবে ওদের ব্যবহার আর কথাবার্তা যে সুবিধের নয় তাও বলেছিল সে! সন্দেহটা তার থেকেই এসেছে। যদিও শেরপা ভদ্রলোকটির নামে কোনো অনুযোগ করেনি সে।

দীপক তারপর বলল—কিন্তু ছবিটা আমরা ফেরত দেব কি করে। ওদের সঙ্গে আর যে আমাদের দেখা হয়নি।

—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন। উৎপল বলল, ভানুসিং-এর কথাবার্তা শুনে ওদের ওপর আমাদের ঘোর সন্দেহই হয়েছে। ওর নাকি ওই তিনটে ছেলের গতিবিধি মোটেই ভাল লাগেনি। তারপর নন্দাখাতে যে যাচ্ছে সে ব্যাপারটাও ওরা গোপনে করেছে ওর কাছে।

—গোপন করার পিছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। প্রেমনাথ মৃদু হেসে বলল, হয়ত ওই আমেরিকান ক্লাবের নির্দেশ। তবে ওই যে তিনটে ছেলের কথা বলছ। ওরা আসল লোক নয়। আসল লোক হল ওই শেরপাটি। এরা তিনজন ট্র্যাভেলিং এজেন্টের লোক। বুঝতেই পারছ আধুনিক দিল্লীর সব ছেলে। মদ-টদ এসব আজকালকার হাওয়া। এই সব ছেলেরা কি এই পাহাড়ে চলে।

—যাক্ আপনার সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপার থেকে অন্তত বাঁচলাম আমরা। উৎপলও হেসে বলল, ভারারিতে নেমে আর থানা-পুলিশ করতে হবে না। আমরা তাহলে ছবিটা আপনাকে দিয়ে দিই। ওদের চিঠি যখন আপনাদের কাছে রয়েছে এই ছবিটাও দিয়ে দেবেন তার সঙ্গে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিতে পারো। প্রেমনাথ মাথা হেলিয়ে বলল, ছবিটা ওদের খুবই প্রয়োজনীয়। দিয়ে দিতে পারলে ওদের কাজের সুবিধে হবে।

উৎপল উঠে দাঁড়াল।—ঠিক আছে ওটা আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

দীপকের দিকে ঘুরে বলল সে—তুই বোস্ আমি আসছি। ছবিটা এদের দিয়ে তারপর নীচে বেড়াতে যাব।

উৎপল বেরিয়ে গেল।

প্রেমনাথ অনেক হাল্কা শরীরে নড়ে-চড়ে বসল খাটে। যাক্ এতক্ষণে একটা কাজের কাজ হয়েছে। এদের মনের সন্দেহ দূর করে ছবিটাও উদ্ধার হল এদের হাত থেকে। লোমীও আপাতত নিশ্চিত হল। কিন্তু তথাপি প্রেমনাথের এই কুটিল চালাকি সত্ত্বেও তার দলের ওপর ওর বিরক্তিভাব বিন্দু-মাত্র কমল না। যাদের গাফিলতিতে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তারা যে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এটা সে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে। কিন্তু এ মূহূর্তে আরেকটা ছেলে ঘরে থাকায় সে সহজ স্বাভাবিক হয়েই বসে রইল চেয়ারে।

দীপক তখন টুকটাক কথা বলে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

রেষ্টুরেন্ট-কাম-লজটা বাংলোর চত্বরের সংলগ্ন হলেও একটু নীচে। বাংলো থেকে গ্রামে নামার পথের ধারে। উৎপল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাংলোর চত্বরে উঠে বারান্দায় এসে দেখল সৌরভ ও মৃণাল দুজন বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছে। আরেকজন তরুণ ভদ্রলোক একটু দূরে চেয়ারে বসে। একে অবশ্য ওরা এখানে এসেই দেখেছে। বয়স্ক দুজনের একজনকে দেখে বুঝতে পারল উৎপল, ইনিই সৌরভের ডাক্তারকাকু।

সৌরভও ওকে দেখামাত্র ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, এ হল আমাদের তৃতীয় সঙ্গী কাকু—উৎপল বোস। সৌরভ তারপর উৎপলের দিকে ঘুরেও বলতে গেল।

তার আগেই উৎপল ঝুঁকে ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে করতে বলল, বুঝতে পেরেছি। আপনি ভোর বেলায় উঠে কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু?

—একটা প্রয়োজনে বেরিয়েছিলাম বাবা। ডাক্তারবাবু ওর মাথায় হাত রেখে বললেন। তা তোমাদের চার মূর্তির চতুর্থজন কোথায়?

—আমি ওকে ডেকে আনছি এক্ষুনি। উৎপল হেসে বলল, আমরা ওদিকে দু'ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম। বলে সে ঘরে ঢুকে চটপট নিজের রকস্যাক থেকে ছবির কালো খামটা বের করে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

হাতে খামটা দেখে সৌরভ বলল, ওটা নিয়ে আবার কি করছিস ?

উৎপল বলল, ফেরত দিতে যাচ্ছি। ওই ভারতীয় ভদ্রলোক আই-এম. এফ-র এক কর্তা-ব্যক্তির ভাই। উনি এদের ব্যাপারে সব জানেন। আসলে এদের ওপর আমরা বাজে সন্দেহ করছি। নন্দাখাতে নাকি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেই এসেছে এরা। পরে তোকে বলব সব। আমি আসছি এখুনি দীপককে নিয়ে।

উৎপল চলে গেল।

ডাক্তারবাবু ওদের কথাবার্তা শুনে ঘুরে বলল, কি ব্যাপার সৌরভ। নন্দাখাতের দুর্ঘটনাস্থল নিয়ে কি হল ? কোন্ দুর্ঘটনা ?

—কদিন আগে এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে কাকাবাবু। সৌরভ বলল, একটা আমেরিকান অভিযাত্রী দলের পাঁচজন মারা গেছে—। আমাদের হাতে ঘটনাচক্রে সেই দুর্ঘটনায় নিহত একটি মেয়ের ছবি এসে পড়েছে।

—ছবি ! কি করে ?

ঢাকুরীর কথাটা তারপর সংক্ষেপে বলল সৌরভ ও তার সঙ্গে ভানু সিং-এর ছবির মেয়েটিকে চিনতে পারার কথাটাও।

ডাক্তারবাবু আর বাকিটুকু শোনার আগে চঞ্চল হয়ে বললেন, একবার যাও তো তাড়াতাড়ি। ছবিটা নিয়ে এস। দেখব আমি।

সৌরভ ডাক্তারবাবুর ঔৎসুক্যের মাত্রাটা দেখে একটু বিস্মিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছুটে গেল রেষ্টুরেন্টের দিকে।

রেষ্টুরেন্টের সেই ঘর থেকে উৎপল আর দীপক তখন বেরিয়ে আসছে। সৌরভ দৌড়তে দৌড়তে ওদের কাছে গিয়ে বলল, ছবিটা কোথায় ?

—কেন ? উৎপল বলল, মিঃ ত্রিবেদীকে দিয়েছি।

—কাকাবাবু একটু দেখতে চাইছেন।

সৌরভের কথা শুনে উৎপল আবার ঘরে ঢুকল। পেছন-পেছন দীপক ও সৌরভও। ছবিটা তখন লোমীর হাতে। খাম থেকে বার করে গাঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। ওরা আবার হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকতে ,অস্থির হয়ে চাইল। প্রেমনাথও পাশে দাঁড়ান। ঘুরে বলল—কি ব্যাপার ?

—ছবিটা একটু দরকার মিঃ ত্রিবেদী। উৎপল নম্র স্বরে বলল।

লোমী শক্ত হল। প্রেমনাথ কয়েকটা ঝেড়ো নিশ্বাস ছেড়ে বলল, কেন কি হল আবার?

—না। ওটা আমার কাকাবাবু একটু দেখতে চান।

উৎপলের কথাটা শুনে এক মুহূর্ত ভাবল প্রেমনাথ। ছবিটা হাত ছাড়া করার মোটেই ইচ্ছে নেই ওর। কিন্তু কাজটা সহজে হলেই ভাল হয়। এদের মনে সন্দেহ জাগালে ব্যাপারটা সেই একই বিশ্রী অবস্থায় থেকে যাবে। লামীর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চল আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ করব।

লোমীর দিকে ফিরে একটা ইশারা করে ছবিটা সে ঢুকিয়ে নিল খামে। তারপর ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

বাংলোর বারান্দায় এসে প্রেমনাথ ডাক্তারবাবুর সামনে হাত জোড় করে মৃদু হেসে বলল, আমার নাম জীবন ত্রিবেদী। এদের সঙ্গে আলাপ হল তাই আপনার সঙ্গেও গল্প করতে এলাম।

—নিশ্চয়ই। বসুন। ডাক্তারবাবু সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন—আমার নাম ডাক্তার জয়ন্ত বোস। মুখিয়াজী তখন চলে গেছেন।

—আচ্ছা আপনি ডাক্তার। খুব খুশী হলাম। প্রেমনাথ অসীম ভদ্রতা দেখিয়ে বলল, ছবিটা আপনি দেখতে চেয়েছেন। বলে খামের ভেতর থেকে ফটোটা বার করে ডাক্তারবাবুর হাতে দিল সে।

ডাক্তারবাবু ফটোটার ওপর প্রথম দৃষ্টি দিয়েই চমকে উঠলেন। আরে এ তো সেই মেয়ে যাকে আজকেই তিনি সুন্দরবাবার গুহায় দেখে এসেছেন। এত সুন্দর মেয়েটা! এত স্বাস্থ্যবতী! ইস্ আর এখন কি দুরবস্থা। মুখের আদলটুকু ছাড়া এই ছবির সঙ্গে তার আর বিশেষ মিল নেই। আর মিল আছে শুধু গলার হারটার সঙ্গে। ক্রসের লকেটটা এখানে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে এই হারই ওর বুকে জ্বল জ্বল করছে। মেয়েটির শীর্ণকায় শরীর ও ঘুমন্ত মুখটুকু দেখার পর এই হাসি-খুশি প্রাণোচ্ছল ছবিটা দেখে যেমন মুগ্ধ হলেন ডাক্তারবাবু তেমনি তার বুকে একটা ব্যাথারও মোচড় মেরে উঠল। আহা রে! মেয়েটি এই অবস্থায় আবার ফিরে আসবে তো! ডাক্তারবাবু মনে-মনে ভাবলেন, এই মেয়েটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তা না হলে ডাক্তার হওয়ার সার্থকতা কোথায়।

এই সব কথায় বিভোর হয়ে ভাবছিলেন তিনি। প্রেমনাথ অধৈর্য হ...
বলল। ডাক্তারবাবু মেয়েটি নন্দাখাতের ওপর মারা গেছে কদিন আগে
এই ছবিটা ওর লাশ উদ্ধারকারী দলকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে।

—না, মিঃ ত্রিবেদী! ডাক্তারবাবু ছবি থেকে মুখ তুলে আলতো হে...
বললেন, ও মারা যায় নি। এখনো বেঁচে আছে।

শুধু প্রেমনাথ নয় সৌরভ, উৎপল, মৃণাল দীপক সবাই তখন তীরের মত দৃ...
নিক্ষেপ করল ডাক্তারবাবুর চোখে। কথাটা কেউ যেন বুঝতে পারল না।

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, মেয়েটিকে কিছুক্ষণ আগে আমি দে...
এসেছি। ও এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

—কোথায় দেখে এলেন? প্রেমনাথ অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে বেশ কিছু দূরে এক ঋষিতুল্য সাধুর গুহায় সে প...
আছে। সেই সাধুবাবাই বাঁচিয়েছে তাকে।

—আপনি এই মেয়েটির কথা বলছেন! প্রেমনাথ ছবিটার দিকে আঙু...
দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মেয়েটি। ডাক্তারবাবু মাথা ঝাঁকালেন। ঘটনাটা অব...
রীতিমত অবিশ্বাস্য। তবে এই হিমালয়ের এই সাধুবাবার জন্যই সব সম্ভ...
হয়েছে। তারপর তিনি সংক্ষেপে বললেন এই মেয়েটিকে নিয়ে যা ঘটে...
তাই। শুধু সাধুবাবার নাম ও তার আশ্রমের হদিশের কোনো উল্লেখ করলে...
না। সব শেষে বললেন, তবে এই মেয়েটি এখন প্রায় মৃত্যুপথ যাত্রী। যদি...
সাধুবাবা তাকে সেই পথ থেকে কিছুটা পেছিয়ে এনেছেন। এখন বাকিটু...
ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা সেটা আমাদের আধুনিক ডাক্তারীর ক্ষমতার প্রশ্নে...
সঙ্গে জড়িত। দেখা যাক ওকে কোনোমতে এখানে নিয়ে আসি, তারপ...
ভারারি কিংবা বাগেশ্বরে গিয়ে দেখতে হবে।

ওরা চারজন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শুনছিল সব। প্রেমনাথের তো সব শু...
শ্বাস প্রায় বন্ধই হতে বসেছে। এরকম এক মারাত্মক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও...
মগজের ঘিলু গুলো সব ওলট-পালট করে দিল। লোহার পুতুলের ম...
সে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপরেই হঠাৎ ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার সমীরণ এসে বলল জয়ন্তদা
সবাই আসতে শুরু করেছে। আমি এবার টেবিলটা লাগিয়ে দি এখানে?

ডাক্তারবাবু ওর কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন যেন। তাই তো এখন, তাঁর ডাক্তারীতে বসার কথা। তাকিয়ে দেখলেন বাংলোর চত্বরে ইতিমধ্যে কয়েক জন চিকিৎসা প্রত্যাশী গ্রামবাসী জড়ো হয়েছে।

ডাক্তারবাবু সৌরভের দিকে ঘুরে বললেন, এবার আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আবার পরে কথা হবে।

মৃণাল বলল, ছেড়ে দেবো কি ডাক্তারবাবু। আমরাও আপনার সঙ্গে আছি। আপনি এতদূর থেকে প্রতি বছর এখানে ছুটে আসেন। আমরা না হয় বেড়াতে এসেই আপনাকে একটু সাহায্য করি।

ওরা উঠে সমীরণের সঙ্গে লেগে গেল সাময়িক ডাক্তার খানার সব গোছ-গাছ করতে। প্রেমনাথ কিন্তু তখনো বসে। একটা ব্যাপার সে জানতে পারেনি। মেয়েটির গলার হার এখনো আছে কিনা। সেটা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে সে সুযোগ খুঁজছিল।

তখনই ডাক্তারবাবু বললেন—মিঃ ত্রিবেদী। ছবিখানা আমার কাছে থাক। আমি এটা একবার সাধুবাবাকে দেখাব।

—আর এখন ছবি নিয়ে চিন্তা করে কি হবে। খোদ মানুষটাই যখন বেঁচে আছে। প্রেমনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে ডাক্তারবাবু। তবে একটা কথা, আপনি কি মেয়েটিকে এই অবস্থাতেই দেখেছেন। মানে—এই বেশ, ওর এই গলায় হার সব বহাল আছে?

—বেশ কি আর এতদিন এরকম থাকে। ডাক্তারবাবু চেয়ার থেকে উঠে বললেন—তবে হ্যাঁ হার ছবিতে যেরকম দেখলাম সেরকমই রয়েছে। ওটার সঙ্গে ঝুলছে একটা হোলী ক্রস।

—আচ্ছা নমস্কার ডাক্তারবাবু। আমি আসছি। প্রেমনাথ ত্রস্ত পায়ে অশান্ত মনে ফিরে গেল নিজের ঘরের দিকে।

অসম্ভব! প্রেমনাথর মুখে সব বিস্তারিত শুনে লোমী চাপা গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—ডাক্তারটি তোমায় বুদ্ধু বানিয়েছে। এ কিছুতেই হতে পারেনা।

—না মিঃ লোমী। প্রেমনাথ ঠোঁটের ফাঁকে ফিকে হাসি এনে দৃঢ় স্বরে বলল, অবিশ্বাস আমিও করেছিলাম। কিন্তু গল্প ফেঁদে ডাক্তারের লাভ? তাছাড়া হারটা এখনো নাকি রয়েছে গলায়। লকেটটা যে ক্রসের তাও তিনি বললেন।

লোমী প্রেমনাথের বৃত্তান্ত শুনে এমনিতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এবার লকেট আর হারের সংবাদ শুনে বজ্রাঘাতে মৃত মানুষের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিকই বলেছে প্রেমনাথ। ওর গলায় যে হোলী ক্রসের লকেট সেটা তো ছবিতে নেই। তার মানে ডাক্তার সত্যিই দেখে এসেছে মেয়েটিকে! তাহলে সে জীবিত! কিন্তু কি করে এ সম্ভব হয়! ষোলো-সতেরো দিন আগে ভয়ঙ্কর বরফের তলায় যার জীবন্ত কবর হয়েছে সে কি করে বেঁচে উঠতে পারে?

—না, না! ভাবতে ভাবতে আতঙ্কে বিড়বিড় করে উঠল লোমী। এ কি করে সম্ভব প্রেমনাথ। মেয়েটা বেঁচে থাকলে আমাদের যে চরম সর্বনাশ হবে।

—হিমালয়ে সবই সম্ভব মিঃ লোমী। প্রেমনাথ চিন্তিত স্বরে বলল, আমি আপনাদের কাজে নামার আগে এই পাহাড় নিয়ে যা জেনেছি, অঘটন আর দুর্ঘটনা এখানে সবই ঘটতে পারে। এখন কথা হল এর পর কি কর্তব্য?

—আমি মেয়েটিকে একবার দেখতে চাই। লোমী ব্যাগ্র স্বরে বলল, তুমি কাল ভোরে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে ওই সাধুর আড্ডায়?

—না। তা সম্ভব নয়। প্রেমনাথ মাথা নাড়ল। প্রথম কথা ডাক্তারবাবু ওই সাধুর নাম-ধাম কিছুই আমায় বলেন নি। এবং তিনি বলবেন না তা আমি বুঝতে পেরেছি।

—ডাক্তারবাবু এখন কি করবেন? কবে নিয়ে আসবেন মেয়েটিকে।

—কবে নিয়ে আসবেন এখনো জানতে পারি নি। প্রেমনাথ জবাব দিল। নিয়ে আসবেন এটুকু জানালাম।

—সেটা জানতে হবে তোমায়।

—হ্যাঁ জানব। প্রেমনাথ মাথা হেলিয়ে বলল, কিন্তু এখন তিনি ডাক্তারী নিয়ে ব্যস্ত। আমি পরে গিয়ে জেনে আসব সব।

প্রেমনাথ বসে পড়ল খাটে। আর ভীত সন্ত্রস্ত হতবুদ্ধি লোমী ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগল। মেয়েটির জীবিত থাকার সংবাদ শুনে সে যে এতটা বিচলিত হয়ে পড়বে ভাবতে পারেনি প্রেমনাথ।

রাত নটার পর আবার বিস্তারিত খবর নিয়ে এল প্রেমনাথ। লোমী ওর জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে ছিল। প্রেমনাথ এসে বলল ওকে—আগামীকাল ডাক্তার

খাত্তিতেই থাকছে। মেয়েটিকে সাধুবাবার গুহা থেকে নিয়ে আসার জন্য কাল এখানকার গ্রামপ্রধান একটা স্ট্রেচারের মত কিছু করে দেবে। পরশু চারজন লোক আর ওই গ্রামপ্রধানের সঙ্গে ডাক্তার সেই গুহাতে যাবেন। সেদিন খত্তিতে এসে রাতটা কাটিয়ে তারপর মেয়েটিকে নিয়ে ভারারির জন্য রওনা হবেন। মোটমাট ঠিক হয়ে আছে বাগেশ্বর হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে তারপর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা।

—আর এই চারটে ছেলে। লোমী সব একাগ্র মনে শুনে জিজ্ঞেস করল, এরা কবে যাবে এখান থেকে?

—এদের যাওয়ার কথা ছিল কাল। প্রেমনাথ বলল, কিন্তু ওই ঘটনা শোনার পর ওরা ঠিক করেছে ডাক্তারের সঙ্গেই ফিরবে। মেয়েটির একটা গতি করে তারপর ওরা বাগেশ্বর ছাড়তে চায়।

—এরা তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে সাধুর আস্তানায় যাচ্ছে না?

—না। যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখানকার গ্রামপ্রধান একেবারেই রাজী হয় নি। সাধুবাবা ফালতু লোকজন নাকি একদম পছন্দ করে না। তাই ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

—বেশ তা হলে মেয়েটি পরশু এখানে এসে পৌঁছচ্ছে। লোমী শূন্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে বলল, একটা রাত এখানে থাকবে সে।— আচ্ছা প্রেম তুমি বলেছিলে মেয়েটির অবস্থা নাকি খুবই খারাপ।

—হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল প্রেমনাথ। খারাপ বলতে ডাক্তারের মতে ওর বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য্য। কথা বলতে পারে না দেখতে পারে না শুনতে পারে না এমন কি কিছু অনুভবও করতে পারছে না।

—তোফা! লোমী ডান হাতের চেটোয় বাঁ হাতের আঙুলে টোকা মেরে বলল, তাহলে যা ভেবেছি তাই করতে হবে।

—কি ভেবেছ? প্রেমনাথ তাকাল। গলার হারটা চুরি করবে এখানে?

—হার! লোমী প্রায় অবাক চোখে তাকাল প্রেমনাথের দিকে। ওটা পরের কথা। আগে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে হবে। হার নিশ্চয় নেব কিন্তু তার সঙ্গে মেয়েটির মৃত্যু না হলে ওই হার নিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই। ওর বেঁচে থাকার অর্থ হল আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু। অতএব ওকে এখানেই

শেষ করতে হবে। যাক্ আমি যা ভেবেছি তা হল এই—আমরা দুজন যথারীতি কাল সকালে এখান থেকে বেরোচ্ছি। তবে আমি কাল পরের বাংলো দোয়ালীতে থেকে যাব। তুমি এগিয়ে যাবে ফুরকিয়ার দিকে। তোমার এখন কাজ শুধু ওদের নন্দাখাত থেকে নামিয়ে আনা। ওখানে ওদের ফিরে যাওয়ার আর প্রশ্নই উঠছে না। তবে শেরপাটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ওর মাধ্যমে এই নন্দাখাতে লাশ খুঁজতে আসার খবর আর কেউ না জানতে পারে। আমি দোয়ালী থেকে পরশু এখানে ফিরে আসব। সেদিন ডাক্তারও মেয়েটিকে নিয়ে আসবে এখানে। তখন অসুস্থ সেজে ডাক্তারের সঙ্গে ভিড়ে যাব আমি। ডাক্তারকে অনুরোধ করব যে তিনি যেন আমাকে তার সঙ্গে অন্তত ভারারি পর্যন্ত নিয়ে যান। ব্যাস এর মধ্যেই যা করার করে ফেলতে হবে। আমার মনে হয় মেয়েটির যখন এতই খারাপ অবস্থা ওকে শেষ করা খুব কঠিন কাজ হবে না। কি বল?

—তা তো বটেই। প্রেমনাথ সায় দিল ওর কথায়—ওই মেয়েকে মেরে ফেলা বাঁ হাতের কাজ। শুধু তাই নয় এই মৃত্যু কারো সন্দেহের কারণ হবে না।

—ঠিক বলেছ। সেটাই আমার পক্ষে একটা বিরাট সুবিধে। তবে একটা কথা। ডাক্তার পরশু মেয়েটিকে এনে আবার পরশুই সটকে পড়বে না তো এখান থেকে।

—অসম্ভব। প্রেমনাথ মাথা নাড়ল। তা হতেই পারে না! সাধুবাবার আস্তানাটা এখান থেকে কম দূর নয়। যা শুনলাম বেশ দুর্গম জায়গা। আজও ওরা খুব ভোরে রওনা হয়ে ছিল। ফিরল তো সেই পাঁচটার পর। আর সেদিন ওদের মেয়েটিকে নিয়ে আসতে হবে।

—ঠিক আছে। লোমী উঠে এবার শোবার তোড়জোড় করতে করতে বলল, কাল কিন্তু আমরা একটু দেরী করে বেরবো। ডাক্তার কি করে সেটা দেখে যেতে চাই।

প্রচণ্ড শীতে প্রেমনাথ তখন স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বুকের চেনটা লাগিয়ে 'ঠিক আছে' বলে ডান দিকে পাশ ফিরে চোখ বুজল।

তার পরের দিন যথারীতি যেভাবে যা হওয়ার কথা ছিল সেভাবেই হল সব। ডাক্তারবাবু সকাল নটা নাগাদ বাংলোর বারান্দায় তাঁর ডাক্তারখানা চালু করার

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেমনাথ ও লোমী বেরিয়ে পড়ল দোয়ালীর উদ্দেশ্যে। তার কিছুক্ষণ আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লোমীর পরিচয় হয়ে গেছে। বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে কিছু গল্পও হয়েছে। লোমী তখন নিজের পরিচয় দিয়েছে ক্যানাডার একজন কমার্সের শিক্ষক হিসেবে। ভদ্র শিক্ষিত সেজে ধাপ্পা দিতে ওর কোনো জুড়ি নেই। ডাক্তারবাবুও ওর সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই প্রীত হয়েছেন।

এ মুহূর্তে তিনি রোগী দেখতে ব্যস্ত। তার সাহায্যকারী এখন শুধু সমীরণ নয়। আরো চারজন। চারটে উদ্দাম উত্তাল কিশোর। ওরা রেড-ক্রসের দক্ষ ভলান্টিয়ারদের মত লেগে গেল কাজে।

কত কাজ। কেউ সমীরণের নির্দেশানুযায়ী কোনো পাহাড়ী ছেলের দগদগে ঘা ধুয়ে দিচ্ছে। কেউ গেটেবাতের ব্যথায় কাতর বৃদ্ধাকে ওষুধ খাইয়ে বাংলোর নীচের পথ পর্যন্ত নামিয়ে দিচ্ছে। কেউ আবার আর্ত মাকে ইনজেকশন দেবার সময় তার ক্রন্দনরত শিশুকে সামলাতে ব্যস্ত। এভাবে প্রায় সারাদিন ধরে ওরা এই পাহাড়ী রোগীদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে রাখল। শুধু তাই নয় তারপর চিকিৎসালয় বন্ধ হবার পর সন্ধ্যের সময় ওদের উৎসাহে বাংলোর চত্বরে একটা নাচ-গানেরও আসর বসল। প্রথমে ওরা নিজেরা গাইল গান। তারপর পাহাড়ী মানুষদেরও নামাল সেই আসরে। তখন শুধু গান নয়। পাহাড়ী নাচও হল। ওরাও নাচল ওদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ নির্মল হৈ হুল্লোড় আনন্দে সমতল আর পাহাড়ী মানুষরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সারাদিন এভাবে চারটে কিশোরের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হল খাতির গ্রামবাসীদের মন। ডাক্তারবাবুও খুব খুশী হলেন।

সেদিন রাতে সৌরভরা শুতে যাবার আগে ওদের আগামী কালকের প্রোগ্রামের একটু পরিবর্তন করল। ওরা ঠিক করল কাল ডাক্তারবাবু সাধু-বাবার আশ্রমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার পর এখানে শুধু শুধু না থেকে ওরাও ঢাকুরী চলে যাবে। ঢাকুরীর বাংলোটা অপূর্ব। ওখানে একদিন থাকলে খুবই ভাল লাগবে। তারপর পরশু যখন ডাক্তারবাবু অসুস্থ মেয়েটিকে নিয়ে ঢাকুরী আসবেন তখন তারা আবার মিলিত হবে।

পরের দিন তাই হল। প্রায় একই সঙ্গে ডাক্তারবাবু ও সৌরভরা দুদিকে

রওনা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মুখিয়াজী ও চারজন স্ট্রেচারবাহক। সৌরভদের সঙ্গে ভানুসিং আর বীরসিং।

সেদিন সকাল দশটার মধ্যেই লোমীও তার কুলিকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দোয়ালী থেকে খাতি বাংলোয় এসে পৌছল। পথে একটুর জন্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। দোয়ালী খাতি রাস্তার যে জায়গা থেকে সুন্দরবাবার আশ্রমের দিকে যাওয়ার পথটা বেরিয়ে গেছে সেখানে লোমী পৌছনোর মাত্র মিনিট পনেরো আগে ডাক্তারবাবু বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। লোমী তো আর সেটা জানত না। তাই বাংলোয় এসেই সে ডাক্তারবাবুর খোঁজ করল। বাংলোব চৌকিদার যখন বলল, চারজন লোক ও গ্রামপ্রধানকে নিয়ে তিনি ভোরেই বেরিয়ে গেছেন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ছেলে চারটের কোনো টিকি না দেখতে পেয়ে অবাক হল একটু। চৌকিদার বলল, ওরাও আজ ঢাকুরী চলে গেছে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাল ওদের আবার দেখা হবে। চৌকিদার বাংলোর একটা ঘর খুলে দিল লোমীকে। লোমী সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

তারপর ঘরে বসে বিকেল তিনটে পর্যন্ত সিগারেটের পর সিগারেট খেতে খেতে লোমী ওর মতলব আঁটতে থাকল। কিভাবে মেয়েটির হত্যা করা যায় তার পুরো ছক পরিকল্পনা। ওর বার বার মনে হতে লাগলো আজ রাতেই সে কাজটা হাসিল করে ফেলতে পারবে। বিশেষ করে ছেলে চারটে যখন এখানে নেই সুযোগটা বেড়ে ওর পক্ষে। দেখা যাক কি হয়।

তিনটের পর লোমী বারান্দায় এসে বসল। এখন শুধু অপেক্ষা, কখন ডাক্তার আসে। মেয়েটিকে না দেখা পর্যন্ত বাকি নিশ্চিন্তিটুকু আসছে না মনে। সোয়া তিনটে নাগাদ কম্পাউণ্ডার ছেলেটি এল গ্রামের দিক থেকে। সকালে সুন্দরডুঙা নদীর দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। লোমীর কাছে এসেই বসল। কথা হল দুজনে টুকটাক। লোমী বলল ওকে, অসুস্থতার জন্য দোয়ালী থেকে ফিরে এসেছে। আর এগোতে পারেনি।

তারপর ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশে এলেন ডাক্তারবাবু। লোমী বারান্দা থেকে সামনের উঁচু রাস্তায় তাঁকে আসতে দেখেই বিচলিত হয়ে উঠল। কম্পাউণ্ডার ছেলেটি এগিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গ্রাম প্রধান। আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন দুজন। তার পরেই চারজনের কাঁধে সেই স্ট্রেচার! লোমী এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই স্ট্রেচারের দিকে। যেন পৃথিবরী সপ্তম আশ্চর্যের কোনো বস্তুর দিকে সে তাকিয়ে আছে।

ডানদিকের ঢাল দিয়ে নেমে ওরা সবাই বাংলোর চত্বরে ঢুকল। ডাক্তারবাবু এবার কুলি চারজনের সঙ্গে সাবধানে বাংলো পর্যন্ত এলেন। একবার দৃষ্টি বিনিময় হল লোমীর সঙ্গে। ক্লান্ত শরীরে মৃদু হাসলেন তিনি। তারপর বাংলোয় উঠে নিজের ঘরের দরজাটা খুলে কুলিদের নির্দেশ দিলেন ভেতরে আসতে। লোমীর গাঢ় দৃষ্টি তখনো সেই স্ট্রেচারের ওপর। কম্বলাবৃত একটি দেহ। কিন্তু মুখটা এখনো সে দেখতে পাই নি। দেখার জন্য শেষ পর্যন্ত ওকে উঠে দাঁড়াতে হল। কুলিরা ঘরের ভেতর ঢোকার আগেই নজরে পড়ল ওর। সঙ্গে-সঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল ওর সারা শরীরে। সব সত্যি। সেই মেয়ে। যাকে শুধু ওরা নয় প্রায় সারা অমেরিকার লোক জানে মৃত বলে। শীর্ণ চেহারা। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল যেন এক্ষুনি চোখ খুলে উঠে বসবে। স্ট্রেচারটা গেল ভেতরে ঢুকে। লোমী মন্ত্রপুত পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

এভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল ওর খেয়াল নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল কতগুলো পায়ের শব্দে। লোমী ঘুরে দেখল কয়েকটি ছেলে রুকস্যাক পিঠে বাংলোয় ঢুকছে। শেষ ছেলেটিকে দেখে বুঝল ওরা ঢাকুরী থেকে আসছে। ছেলেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল আসে-পাশে।

লোমীও আবার বসল ওর চেয়ারে। এতক্ষণে সম্বিত ফিরেছে ওর। এ মুহূর্তে যা দেখল তাতে শরীরের সব স্নায়ুগুলো ক্ষণিকের জন্য নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। আসলে একটু আগেও ওর মনে প্রচ্ছন্ন একটা সন্দেহের ছায়া ছিল যে হয়ত যা শুনেছে সবই ভুল। আদৌ এ মেয়ে সে নয়। যাকে নিয়ে ওদের দলে এত সন্ত্রাস এত শঙ্কা এত ভয়। কিন্তু না সব সত্যি। মেয়েটির মৃত্যু হয়নি। সে বেঁচে আছে।

ধীরে ধীরে শক্ত হল লোমী। ওর মগজের গ্রন্থীগুলো আবার সঞ্জীবীত হয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাবেরও হল পরিবর্তন। হিংস্র হয়ে উঠল চোখ। কঠিন দৃষ্টি। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সাপের মত হিস হিস শব্দ। পারলে আজ রাতেই একে মারতে হবে। মেয়েটির মৃত্যু ছাড়া ওদের যখন বাঁচার কোনো

পথ নেই, আর দেরী করা চলবে না। যা করার আজ রাতেই।

লোমী সামনের কালো শিলায়িত পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে খুব যত্ন করে আঁটতে লাগল ওর ফন্দী। কি ভাবে কি করবে তার পুরো ছক-পরিকল্পনা।

এদিকে ডাক্তারবাবুর ঘরের ভেতর তখন মেয়েটিকে নিয়ে বিরাট ব্যস্ততা। মেয়েটিকে শোওয়ানো হয়েছে বাথরুমের দিকের দরজার পাশের খাটে। শোওয়ানোর আগে অবশ্য খাটটাকে সরিয়ে ফায়ার প্লেসের সমান্তরাল করে নেওয়া হয়েছে। যাতে বাথরুম যেতে আসতে গিয়ে কারো অসাবধানতায় কিঞ্চিত আঘাতেরও শিকার না হয় সে। সুন্দরবাবা ডাক্তারবাবুকে একথা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন—মেয়েটির যেরকম সংকটজনক অবস্থা সামান্য চোটও ওর পক্ষে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই ওকে যেন খুবই সাবধানে বিশেষ রক্ষণা-বেক্ষণের মধ্যে রাখা হয়। সেজন্যই ডাক্তারবাবু শুধু খাটটিকে ভেতরের দেওয়ালের দিকে সরিয়েও ক্ষান্ত হন নি, জানলার পাশের লম্বা টেবিলটিকেও তিনি খাটের পাশে বেড়ার মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

ঘরের আসবাবপত্রের এভাবে ওলটপালট করিয়ে মেয়েটির একটা সুরক্ষিত স্থিতি করে তিনি কুলি চারজনকে ছেড়ে দিলেন। তারপর মেয়েটির মাথার কাছে খুব সতর্ক হয়ে বসেলেন ওর স্নায়ু পরীক্ষা করতে। সাবধানে ওপরের কম্বলটা তুলে শীর্ণ কবজিতে মিনিট খানেক হাত রেখে নিশ্চিন্ত হলেন। স্নায়ু খুব দুর্বল হলেও সুন্দরবাবার গুহায় যা দেখেছিলেন এখনও তাই।

—কি বুঝলেন বাবুজী। পাশে দাঁড়ানো মুখিয়াজী জিজ্ঞেস করলেন।

—অবস্থা একই। ডাক্তারবাবু কম্বলটা আবার ভাল করে ঢেকেঢুকে বললেন, তবে দেখছিলাম রাস্তার ধকলে আরো খারাপ হয়েছে কিনা।

—আমি তাহলে এখন যাই বাবুজী। কাল সকালে আবার আসব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বললেন, আপনি যান এবার। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিন। তবে কাল একটু ভোরে আসবেন দেখা করতে হলে। আমরা বেরোতে দেরী করব না।

—জী বাবুজী। মাথা নেড়ে মুখিয়াজী বলে গেলেন।

সমীরণ তারপর মেয়েটির কাছ থেকে এগিয়ে এসে বলল, জয়ন্তদা আজ এতটা হেঁটে খুব ক্লান্ত। আবার কালকেই রওনা হবেন?

—উপায় নেই সমীরণ। ডাক্তারবাবু একটু হাঁপ ছেড়ে বললেন, ক্লান্ত আমি সত্যি। কিন্তু এখন যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছি ঘাড়ে, একে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো ভাল হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হব। দেখছ তো অবস্থা একেবারে অনিশ্চিত।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না জয়ন্তদা। সমীরণ মেয়েটির দিকে আবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এই অবস্থায় মানুষ কি করে বাঁচতে পারে!

ডাক্তারবাবুর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটল। রহস্যের সুরেই বললেন তিনি —এসব মহান হিমালয়ের আশ্চর্য বনৌষধির কেরামতি। আমাদের শাস্ত্র এর কোনো বিশ্লেষণ করতে পারবে না। এখন শেষরক্ষা হয় কিনা সেটাই চিন্তার।

—আজ কোনো ওষুধ দেবেন আপনি?

—না। ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন। আজ সাধুবাবার ওষুধ পড়েছে ওর পেটে। রাতটা কাটুক। কাল অবস্থা বুঝে আমাদের ওষুধ দেব।

—ঠিক আছে। চা-টা খেয়ে আপনি বিশ্রাম নিন। সমীরণ এবার একটু হেসে বলল, এর পর আবার আপনাকে ওই সায়েবটিকে দেখতে হবে।

—কেন ওর কি হল? ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন।

—পেটে নাকি আলসার। সমীরণ জবাব দিল। তাই নিয়ে পাহাড়ে এসেছে। দোয়ালীতে গিয়ে কাল প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল, আর এগোতে পারেনি। আজ ফিরে এসেছে।

—ওর সঙ্গী ত্রিবেদী?

—সে চলে গেছে ফুরকিয়ায়।

এর মধ্যে ডাক্তারবাবুদের কুলি চা ও বিস্কুট নিয়ে ঢুকল ঘরে। ডাক্তারবাবু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বসলেন সামনের খাটে।

মেয়েটিকে নিয়েই আবার কথা শুরু হল ওদের মধ্যে। ডাক্তারী আলোচনা। কি-কি রোগ ওর হতে পারে। কদ্দূর কি করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারবে কিনা। এই সব আর কি।

তার একটু পরেই লোমীর আবির্ভাব হল দরজায়। বারান্দা থেকে উঁকি মেরে সে ডাক্তারবাবুকে বলল, ক্ষমা করবেন। আমি আসতে পারি?

—নিশ্চয়ই। আসুন।

লোমী একটু ব্যাজার মুখ করেই ঢুকল ঘরে। যেন পেটের যন্ত্রণায় কত-

কষ্ট পাচ্ছে। শরীরটাকে কুঁজো করে টলতে টলতে এসে বসল সমীরণের পাশে।

—আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ ডাক্তার। লোমী কৃত্রিম হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আলসার। এমুহূর্তেই আবার চেগে উঠবে ভাবতে পারি নি। এখন তবু ক্যাপসুল খেয়ে যন্ত্রণা অনেক কম। কাল কাটা পাঁঠার মত ছটফট করেছি।

ডাক্তারবাবু এবার ওকে ওর রোগ নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। কতদিনের আলসার। কি কষ্ট। চিকিৎসা এর মধ্যে কি হয়েছে। এখন কোন্ ওষুধ খাচ্ছে ইত্যাদি। ঝানু লোমী সব প্রশ্নেরই তুখোড় জবাব দিতে লাগল। কে বলবে যে ওর আদৌ এসব হয় নি, সব মিথ্যে। শুধু তাই নয় জবাব দিতে দিতে ওর আসল কাজও করে গেল সে। অর্থাৎ যে জন্য এখন এই ঘরে ঢোকা। ঘরটার অবস্থান ও জরীপ করে নিতে চায়। কোথায় মেয়েটিকে শোওয়ান হয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র কি ভাবে আছে। বাথরুমের দরজার ছিটকিনি কি রকম। স-ব। মোদ্দা এই ঘরে আজ মাঝরাতে ও ঢুকতে চায়। একেবারে নিঃশব্দে। তার কি কোন উপায় আছে?

ডাক্তারবাবু জেরা শেষ করে বললেন—আপনি খুব ভাল ওষুধই খাচ্ছেন। মনে তো হচ্ছে খেয়ে ভালেও আছে। তাই নয় কি?

—হ্যাঁ তা আছি। লোমী একবার আড় চোখে টেবিলের ওপারে মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তবে মুশকিল হল এই ওষুধ আমার আর নেই। মাত্র কয়েকটা ছিল হাত ব্যাগে। লগেজ খুলে দেখি আসল প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছি।

—শেষ ক্যাপসুল কখন খেয়েছেন? ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—আজ সকালে।

এবার ডাক্তারবাবু ঘুরে সমীরণকে কয়েকটা ট্যাবলেট দিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর লোমীকে আবার বললেন তিনি, ঠিক আছে মিঃ মাইক আপনাকে আমি অন্য ওষুধ দিচ্ছি। যদিও এগুলো আপনার ক্যাপসুলের চেয়ে একটু কম শক্তিশালী। যাই হোক কাজ যদি না হয় চিন্তার কিছু নেই। আমার কাছে ভাল ইঞ্জেকশন আছে। আপাতত চলে যাবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

—ডাক্তার। লোমী অতি ভদ্র সেজে আর্ত স্বরে বলল এবার। নিশ্চিন্ত

হওয়ার জন্যই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সকালে যখন দেখলাম আর ক্যাপসুল নেই তখনই আপনার কথা মনে পড়ল। আমি আপনার সঙ্গে অন্তত ভারারি পর্যন্ত যেতে চাই।

—এটা কোনো বলার মত কথা হল মিঃ মাইক। ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমি ডাক্তার আপনি রোগী। সব জানার পরও এরকম বিপজ্জনক জায়গায় আপনাকে ফেলে যেতে পারি!

—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। লোমী মাথা নত করে বলল। এদিকে সমীরণ তখন ওর ওষুধ বার করার জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেছে। টেবিলের ওপরেই ওষুধের বাক্সগুলো। ডাক্তারবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখো সমীরণ খুব সাবধানে!

কারণ টেবিলের ওপাশেই মেয়েটির শয্যা। সমীরণ অবশ্য সতর্ক হয়েই বাক্স হাতড়াচ্ছে।

লোমী হঠাৎ বলল, ডাক্তার আমার কথা এবার ছাড়ুন। যাকে আপনি আজ নিয়ে এলেন তার কথা বলুন। সেদিন কি সব শুনে গেলাম। এ তো অলৌকিক ঘটনা।

—হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু ভাবুক দৃষ্টিতে তাকালেন, বলতে গেলে তাই। অন্তত আমি আমার সীমিত বিদ্যায় এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

—আমি কি মেয়েটিকে একটু দেখতে পারি?

—আসুন। ডাক্তারবাবু উঠলেন চেয়ার থেকে। তিনি প্রথমে এগিয়ে গেলেন মেয়েটির খাটের দিকে। লোমী সন্তর্পণে টেবিলটাকে ঘুরে ওর মাথার পাশে এল। এবার সত্যি পাটা টলে উঠল ওর। এত কাছে গিয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে হয়।

ডাক্তারবাবু খাটের ওপাশে গিয়ে ঝুঁকে মেয়েটির নাকের নীচে ডান হাতের আঙুল রাখলেন। অবস্থা একই। মৃত্যুর সঙ্গে সমানে লড়াই করে চলেছে মেয়েটা।

লোমী গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল আবার সেই মুখটার দিকে। দৃষ্টি তো নয় যেন অগুনের দুটো শিখা ছুটে গেল। হাত দুটো নিসপিশ করে উঠল একবার। দেবে নাকি গলা টিপে সব শেষ করে এক্ষুনি। একে না মারতে পারলে আর যে রক্ষা নেই। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে শামলে নিল লোমী।

আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে। মাত্র কটা ঘণ্টা। তারপর আজকেই—

লোমীর দৃষ্টি হঠাৎ থমকে গেল। ডাক্তারবাবু এমুহূর্তে মেয়েটির বুকের কম্বল তুলে আবার ওর নাড়ী দেখছেন। তখনি বুকের ওপর গলার হার আর তার লকেটটা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝিম করে উঠল মাথা। এই তো সেই লকেট। যার জন্য এত তোলপাড় ওদের দলে। ওই লকেটটার জন্যই পামেরো আর ওর ছুটে আসা এখানে। মেয়েটাকে মেরে লকেটটা নিয়ে চলে গেলেই সব চিন্তা আর অশান্তির অবসান হবে। কিন্তু না। খুব সাবধানে খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে সব। করার পর কোনো সন্দেহ কোনো সূত্র রাখলেও চলবে না। তাতেও ঘোর বিপদ। অতএব—

লোমীর সম্বিত ফিরল। ডাক্তারবাবু কম্বলটা আবার সযত্নে ঢেকে দিলেন গায়ে। লোমী এবার নিজেকে স্বাভাবিক করে কপট চিন্তা দেখিয়ে বলল, ডাক্তার কদিন ধরে মেয়েটি এরকম বেহুশ?

—পনেরো দিনের বেশী। ডাক্তারবাবু খাট থেকে সরে উত্তর দিলেন।

—অবস্থা কেমন দেখছেন?

—খুব সঙ্গীন। ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে বললেন, বলতে গেলে যায়-যায় অবস্থা।

নিশ্চিন্তির একটা শ্বাস নিল লোমী। মুখে অবশ্য বলল, ঈশ্বর যেন ওকে রক্ষা করে। আচ্ছা ডাক্তার ধন্যবাদ আমি একটু শুই গিয়ে।

—এই নিন। সমীরণ ওর দিকে টেবলেটের একটা স্ট্রিপ এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার টেবলেট। আজ এখন একটা খাবেন। কাল তিনবার।

—ধন্যবাদ। লোমী স্ট্রিপটা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

লোমী যখন মেয়েটিকে আজ রাতেই হত্যা করার চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখন নন্দাখাতের বেস ক্যাম্পের তাবুঁতে রাজ আর প্রেমনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে।

প্রেমনাথ ঘণ্টা তিনেক আগে ফুরকিয়া থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। এই পথটুকু পেরোতে গিয়ে হাড়ে-হাড়ে সে টের পেয়েছে যে পামেরোর কাজ নিয়ে কি সাংঘাতিক ঝক্কিটাই নিয়েছে। আগে প্রাণ তারপর তো সব। সেই প্রাণটাই কয়েকবার যেতে বসেছিল এই দুর্গম বরফে ঢাকা পাহাড়ী পথে

আসতে গিয়ে। মাঝ-পথে এসে একবার ঠিক করেই ফেলেছিল, ফিরে যাবে। কিন্তু আটই জুনের ওই হেলিকপ্টারের ভয়েই বাধ্য হয়ে প্রাণ হাতে নিয়েও আসতে হয়েছে। ভাগ্যিস সঙ্গের কুলীটা বরফে একটু চোস্ত ছিল তাই বাঁচোয়া। নইলে বরফের খাদে কতবার যে পড়ত প্রেমনাথ তার ইয়ত্তা নেই। ওর সাহায্যেই এদ্দুর আসা গেছে। যদিও এই অব্দি ওকে নিয়ে আসার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তাই এখানে রাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটু পরেই ওকে ছেড়ে দিয়েছে প্রেমনাথ। বেশিক্ষণ রেখে ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ কি।

কিন্তু এত ধকলের পর তাঁবুর ভেতর এসে রাজের কাছ থেকে প্রথম যে খবরটা পেল প্রেমনাথ সেটা ওর কাছে রীতিমত এক বজ্রাঘাত। গুলসন নাকি মারা গেছে। ওর কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশদভাবে বলল রাজ। ছবিটা কি করে হাতছাড়া হয়েছে তার কাহিনী এতক্ষণে জানতে পারল প্রেমনাথ। সব শুনে রাজকে ও তীব্র ভৎসনাই করল। প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওই অবস্থায় গুলসনের হেপাজত থেকে ছবিখানা ওরা সরাল না কেন? যাক্ এসব হল ঘণ্টা তিনেক আগেকার কথা। কিন্তু এখন ঘটনা আরো মারাত্মক।

ডেভিডের সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তখন থেকে। টানা ঘণ্টা আড়াই চেষ্টা করার পর এই কিছুক্ষণ আগে সংযোগ পাওয়া গেল। তাও ডেভিডের সঙ্গে নয় শোনা গেল জিংমোর গলা। আর্দ্র গম্ভীর স্বরে জিংমো একটা কথাই বলল তখন, ডেভিড আজ বেলা আড়াইটে নাগাদ বরফের ধসের নীচে চাপা পড়ে মারা গেছে। রাজ ওয়্যারলেসের মাউথ পিসে বেশ কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে গেল। প্রেমনাথের অবস্থাও তখন তথৈবচ। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় রাজের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

রাজ তখন সম্বিত ফিরে পেয়ে প্রলাপ বকার মত জিজ্ঞেস করছে, কি বলছ তুমি জিংমো আবার বল! আমি তোমার কথা ঠিক শুনতে পাচ্ছি না! জোরে বল আবার!

কিন্তু আবার সেই একই কথা আওড়াল জিংমো। এবার বিশদ ভাবে যা বলল তা হল এই—গত দুদিন ধরে ওরা হন্যে হয়ে বরফ খুঁড়ছে। কিন্তু কোনো লাশের টিকিও ওরা পায় নি। শেষপর্যন্ত আজ ডেভিড এমন এক বিপজ্জনক জায়গায় বরফ খুঁড়তে গিয়েছিল যেখানে ওকে যেতে বারবার

নিষেধ করেছে জিংমো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডেভিড ওই দিকে গেছে। এ নিয়ে শেষপর্যন্ত ডেভিডের সঙ্গে ওর প্রচণ্ড বচসাও হয়েছে। কিন্তু ডেভিড কিছুতেই মানে নি। 'জিংমো তখন অন্যদিকে বরফ খুঁড়তে শুরু করে। তারপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ প্রচণ্ড শব্দ শুনে সে ডেভিডের দিকে ছুটে যায়। ডেভিড তখন নিজেরই খোড়া বরফের জন্য ওপরের বিশাল চাই ধসে পড়ায় তার তলায় সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। সেই বরফ পরিষ্কার করে ডেভিডের আর লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এতক্ষণ সে চেষ্টাই করছিল জিংমো। কিন্তু ওখানে যা অবস্থা ওর দ্বারা একা ওই লাশ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই কাল ও নীচে নেমে আসছে।

ব্যাস এই বলেই জিংমো যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। ওর কথা বলার ধরন শুনেই বোঝা গিয়েছিল যে ও তখন প্রচণ্ড ক্লান্ত। তার মানে এতক্ষণ সত্যিই সে ডেভিডের লাশ খোঁজার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। রাজ একটা দীর্ঘ ঝোড়ো নিশ্বাস ছেড়ে ওয়্যারলেসের সুইচটা বন্ধ করে দিল।

তারপর থেকেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে দুজন।

অনেকক্ষণ পর রাজ উঠে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, হল বস্? দুটো জান্ এখানে গেল তাহলে। আমি আর এই খুনী জায়গায় থাকছি না। পাততাড়ি কালকেই গুটোতে হবে।

প্রেমনাথ যে পাততাড়িই গুটোতে এসেছে এখানে সে কথা এখনো সে বলেনি ওকে। ডেভিডের মৃত্যু হজম করা ওর পক্ষে খুব কঠিন ছিল। কারণ ডেভিড ছিল ওর বহু মূল্য সাকরেদ। কিন্তু করার কিছু নেই। যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। কোনোমতে নিজেকে সামলে সে বিড়বিড় করে বলল, হ্যাঁ কাল আমরা নেমেই যাব। তবে আমি এখন ভাবছি শেরপাটার কথা।

রাজ ভুঁরু কোঁচকাল—ওকে নিয়ে এখন ভাবনা কি?

—যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—ব্যবস্থা? রাজ তাকাল। কি ব্যবস্থা করবে ওর?

—সে কথাও খুলে বলতে হবে! প্রেমনাথ ওর স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বের স্বরে বলল, ওর ফিরে যাওয়া মানেই লাশ খুঁজতে আসার ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়া।

গুলসনের মৃত্যু ও সব শেষে ডেভিডের মৃত্যু রাজের মেজাজ এখন অন্য-

ম করে দিয়েছে। আতঙ্ক মিশ্রিত এই পাহাড়ী পরিবেশের প্রভাব পুরো ষটাকেই যেন বদলে দিয়েছে একেবারে। প্রেমনাথের চোখের দিকে জাসুজি তাকিয়ে সে কঠিন স্বরে বলল, বস্ ওসব ব্যবস্থার কথা এখন ভুলে । শেরপা যেমন এসেছে তেমনি ফিরে যাবে এখান থেকে।

চমকে উঠল প্রেমনাথ। মাথায় ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠল। এ র্ত ওর সামনে এ কোন্ রাজ। এভাবে মাথা উঁচু করে কখনো তো সে বলেনি ওর সঙ্গে! নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করে প্রেমনাথ গম্ভীর বলল, কি বলতে চাও তুমি? এই বরফের রাস্তা শেরাপাটাকে ছাড়া মরা পার হতে পারব না, এই তো। আমিও সে কথা জানি। ওর ব্যবস্থা পরেই আমরা করব।

—কোনো ব্যবস্থা নয় বস্। যেন রাজ নয় ডেভিড। কোমরে হাত রেখে একই সুরে সে নির্দেশ দিল—যা বলেছি, জিংমো যেমন এসেছে তেমনি দেশে ফিরে যাবে।

—রাজ! প্রেমনাথ উঠে রক্তদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। মুখ সামলে বলো।

—আমি সামলেই আছি। তুমিও নিজেকে সামলে রেখো। জিংমোর ন্য একটি চুলেও যদি হাত পড়ে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

প্রেমনাথ তিলবিল করে কেঁপে উঠল। এর পর আর কি নিজেকে রোখা ! এত বড় ভয়ংকর এক নৃশংস দলের সর্দার সে। তার ভয়ে শুধু এই ছোঁড়ারা কেন বলতে গেলে সারা দেশের লোকেরা থরথর করে। শট্ সে প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তলটা বার করল। কিন্তু রাজও তৎপরতায় যায় না। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের লম্বা ছুরিটা বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনাথের ওপর। প্রেমনাথ তার আগেই গুলি চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গুলি রাজের গা একটুর জন্য বাঁচিয়ে তাঁবুটাকে ফুটো করে দিল। তারপর জরই দীর্ঘ ছুরিটা প্রচণ্ড বেগে ঢুকে গেল প্রেমনাথের বুকের পাঁজরে। কি দিয়ে রক্ত ফুঁড়ে বেরলো। একটা মরণ চিৎকার করে প্রেমনাথ লুটিয়ে ল মাটিতে।

রাজ দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে নিল কিছুক্ষণ। হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় একটু ক গেলেও পরমুহূর্তেই সে দাঁতে দাঁত চেপে তাকাল প্রেমনাথের দিকে। এ

মুহূর্তে কেন যেন ওর ভীষণ তৃপ্তি হল। সারা শরীরে অসীম আনন্দের জোয়ার। জীবনে আরো খুন করেছে রাজ কিন্তু এরকম তৃপ্তি কোনদিন পায়নি। বহু কুখ্যাত অপরাধের শিরোমণি এই প্রেমনাথ। বহু নির্দোষ নিষ্পাপ মানুষের কাছে ত্রাসের প্রতিমূর্তি। কত যে হত্যা সে করেছে করিয়েছে। কত জীবনেব সুখ-শান্তি নির্মূল হয়েছে ওর হাতে তার কোনো হিসেব নেই। রাজের অপরাধী হওয়ার হাতে-খড়িও ওর কাছে। কিন্তু এখন আর রাজ সে রাজ নেই। এই নিস্তব্ধ নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে ওই শেরপা ছেলে জিংমো ওকে নতুন পথ দেখিয়েছে। দেখিয়েছে নতুন জীবনের হদিশ। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের কাছে নিজেরা যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ যে মানুষের প্রাণ তা গুলসনের মৃত্যু দেখেই বুঝতে পেরেছিল। আর বুঝল ডেভিডের মৃত্যু সংবাদ শুনে। এই প্রাণের কদরও সে অনুভব করল এখানে এসেই—যখন জিংমো ওর নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গুলসনকে বাঁচানোর আশায় নামল সেই বরফের মরণ খাদে। মানুষই মানুষের রক্ষাকর্তা আবার সেই মানুষই কোথাও ভয়ংকর নিষ্ঠুর অত্যাচারী পরস্পরের ওপর। রাজ তো সেরকমই এক দলের লোক। কিন্তু না। আর নয়। এই পাহাড়ে এসে সারা জীবনের সে শিক্ষা পেয়ে গেছে। জিংমো ওকে প্রতি পদে-পদে শিখিয়েছে সহানুভূতি কাকে বলে। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের কি অপূর্ব আস্বাদ। তারপরও সে প্রেমনাথকে সাহায্য করবে জিংমোকে খুন করতে? নিজের প্রাণ থাকতে নয়। জিংমো এখন ওর হৃদয়ের বন্ধু।

ঝুঁকে প্রেমনাথের লুটোনো দেহ থেকে হাত দুটো বের করে ওকে টানতে শুরু করল রাজ। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। তারপর বরফের ওপর দিয়ে ঘসটে নিয়ে গেল একেবারে ডান দিকের খাদের ধারে। লাথি মেরে দেহটাকে ঠেলে ফেল দিল সেই অতল অন্ধকারে। ব্যস তিনটে পাপ পর-পর বিদায় হল। গুলসন ডেভিড আর প্রেমনাথ। এখন জিংমোর জন্য শুধু অপেক্ষা। নতুন রাজ একেবারে নতুন মন নিয়ে ওর হাত ধরে ফিরে যাবে এখান থেকে।

এদিকে খাতি বাংলোয় লোমী তখন নিজের ঘরে বসে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এখন বাজে রাত সাড়ে নটা। এইসব জায়গায় বলতে গেলে

খন গভীর রাত। এখানে এমনিতেও করার কিছু নেই। তারপর হাড়-হিম করা ঠাণ্ডা। যে যার ঘরে অনেক আগেই সেঁধিয়ে যায়। অনেকে এখন ঘুমেও আচ্ছন্ন। কিন্তু লোমীর ঘুম দুদিন আগে থেকেই ঘুচে গেছে। আজ তা চরম অবস্থা। আর কিছুক্ষণ পর মেয়েটিকে কি ভাবে খুন করবে তারই ফন্দী আঁটতে ব্যস্ত এখন। মোদ্দা কথা আজ মাঝরাতে ওকে পাশের ঘরে ঢুকতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে? এ নিয়ে দুটো পরিকল্পনা ওর এর মধ্যে বানচাল হয়ে গেছে। তারমধ্যে প্রথমটা ছিল ডাক্তারবাবুদের ঘরের পেছন দিকের ব্যথরুম দিয়ে ঢোকার। ভেবেছিল জলের অজুহাতে কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে একটু রাত হলে ওই বাথরুমে ঢুকে পেছনের দরজার ছিটকিনিটা আলতো ভাবে খুলে রাখবে। কিন্তু বিকেলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ও দেখেছে বাংলোর দুই স্যুটই একরকম। অর্থাৎ ওটাতেও এই অংশের তে বাথরুমের পাশে রয়েছে একটা ছোট ঘর। তারপর সামনের ঘরটা। ছিটকিনি খোলা দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকতে পারলেও সমস্যা পরের দুটো দরজা নিয়ে। ওগুলো রাতে ভেতর থেকে বন্ধ থাকারই কথা। এবং সে দরজাগুলোর হুড়কো ঠিক সুবিধের নয়। অতএব ফন্দীটা নাকচ হল। দ্বিতীয় উপায় ভেবেছিল, যে নতুন দলটা এসেছে তাদের সে পাহাড়ী কেতা অনুযায়ী নিজের ঘরটা ছেড়ে দেবে। ও পরে নিজে সে আশ্রয় নেবে ডাক্তার-বাবুর ঘরে। রেষ্টুরেন্টের ঘরের একটা জানলা ভাঙা বলে ও নিজে অসুস্থ হওয়ার দরুণ হয়ত এটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব ছিল। কিন্তু সে গুড়েও বালি। কারণ বিকেলে ডাক্তারবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে লোমী দেখল ওই দলটি বাংলোর পাশের চত্বরে তাঁবু টাঙাচ্ছে। দেখে একেবারে চুপসে গেল ওর মুখ।

তারপর থেকেই ও ভেবে চলেছে নতুন কায়দা। নতুন পথের হদিশ। কিছু একটা উপায় ওকে বের করতেই হবে। সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়ে নিজের ভাবনায় গুম হয়ে বসে রইল লোমী।

দরজার দুম-দুম ধাক্কার প্রথম আওয়াজটা শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন ডাক্তারবাবু। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছেন সেই রাত সাড়ে আটটায়। কিন্তু মেয়েটির চিন্তায় প্রথম টানা এক ঘণ্টা একফোঁটাও ঘুম আসেনি। এখন যেই একটু এল ওমনি এই করাঘাত। সমীরণ কিন্তু তখনো ঘুমে আচ্ছন্ন। ডাক্তার-

বাবুর খাটটা দরজার পাশেই ছিল। উঠে বসে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন—কে? কে?

বাইরে থেকে ইংরেজীতে উদগ্রীব কণ্ঠে উত্তর এল—দোহাই ডাক্তারব একটু দরজাটা খুলুন। তাড়াতাড়ি—

সমীরণ তার পরেই উঠল। চোখ মুছে জিজ্ঞেস করল—কি হল জয়ন্তদা

—দরজাটা একটু খোলো সমীরণ। ডাক্তারবাবু টর্চ জ্বেলে বললে সাহেবের যন্ত্রণা বেড়েছে বোধহয়।

সমীরণ তলায় কার্পেটের ওপর ফোম ম্যাট্রেস পেতে বুকের ওপর হা দুটো জাপটে হি হি করতে করতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এর মা ডাক্তারবাবু বিছানায় বসে-বসেই একটা মোম জ্বালিয়ে নিয়েছেন।

দরজা খুলতেই লোমী হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে। ডাক্তারবাবু মোমে আলোয় দেখলেন, ওর ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, ডাক্তার আমাকে বাঁচাও! ও ঘরে আমি শু পারব না। দয়া করে এঘরে আমাকে আশ্রয় দাও। দোহাই তোমার—

—কেন, কি হল? ডাক্তারবাবু কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাথা কি খুব বেড়েছে তোমার?

—না, না ডাক্তার। ব্যাথাট্যাথা ওসব এখন কিছু নেই। লোমী প্রায় আর্তস্বরে বলল, ও ঘরে কোন অশুভ আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবেক হলেই আমার গলা টিপে ধরত।

—কি বলছ তুমি। ডাক্তারবাবু অবাক স্বরে বললেন, কার অশুভ আত্মা কিছু দেখেছ তুমি?

—দেখেছি কি। লোমী কাঁপতে কাঁপতে বসল ডাক্তারবাবুর খাটের পাশে খস খসে শুকনো গলায় বলল, ঘুমচ্ছিলাম। হঠাৎ টের পেলাম দুটো বর ঠাণ্ডা হাত আমার গলা দুদিক থেকে স্পর্শ করছে। চেঁচিয়ে উঠলাম তখন কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। হঠাৎ কোথা থেকে জোর পেয়ে এ ঝটকায় উঠে পড়লাম তারপর। দেখি কে যেন ছুটে গেল ঘরের কোণে অন্ধকারে তার জ্বলন্ত দুটো চোখ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। বেহুঁশ হয়ে পড়তাম। ভাগ্যিস দরজাটা পাশে ছিল। খুলে বেরিয়ে এসেছি তারপর থেকে ডাকছি আপনাদের।

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে মৃদু হেসে বললেন—ওটা আপনার মনের ভুল। আত্মা-টাত্মা ওসব বাজে কথা। এরকম কখনো হতে পারে?

—না না ডাক্তার। লোমী যেন কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেল। ভীত কণ্ঠে বলল—আমার গলায় ওর ঠাণ্ডা স্পর্শ এখনো লেগে রয়েছে। ওর দুটো জ্বলন্ত চোখ —ওফ আমি আর ভাবতে পারছি না।

—ঠিক আছে। ডাক্তারবাবু আশ্বস্ত করার জন্য ওকে বললেন—আমার কম্পাউণ্ডার তোমার সঙ্গে বাকী রাতটা শোবে। তোমার ভয়ের কিছু নেই।

—দোহাই ডাক্তার। লোমী মুখ করুণ করে অনুনয়ের স্বরে বলল, ওঘরে আমাকে আর শুতে বলবেন না, শুধু আজকের রাতটুকু। আমি তাহলে নির্ঘাত মারা যাব। দয়া করে আপনার এ ঘরে আমাকে একটু জায়গা দিন।

সুন্দর অভিনয় করল লোমী। ডাক্তারবাবুও তাই ভাবলেন। উচ্চতার জন্য অনেক সময় এরকম চোখের বিভ্রম হয়। তারপর ও অসুস্থ। একা একটা ঘরে শুয়ে আছে। ভয় পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হল এ ঘরে কি করে ওকে শুতে দেবেন। একে আসবার পত্র ওলট-পালট। তারপর এ ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থায় একটি রুগী। ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করলেন ওকে—তোমার ম্যাট্রেস আছে?

—হ্যাঁ ডাক্তার ম্যাট্রেস আছে। লোমী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। ভাল ম্যাট্রেস, আমি অনায়াসে এখানে নীচে এক কোণে শুয়ে যেতে পারব।

—ঠিক আছে। তাহলে চলে আসুন।

—কিন্তু···ডাক্তার—একটা কথা—

—কি? লোমীর ব্যাজার মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু।

—আমি ও ঘরে আজ আর ঢুকতে পারব না। লোমী সমীরণের দিকে ঘুরে মিনতি করে বলল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন দয়া করে আমার ম্যাট্রেস আর স্লিপিং ব্যাগটা একটু নিয়ে আসবেন? তাহলে খুব বাধিত হব।

সমীরণ দাঁড়িয়েই ছিল। লোমীর অনুরোধে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

তারপর সমীরণের বিছানার মাথার দিকে বাথরুমের দরজার পাশে ম্যাট্রেস পাতা হল ওর। লোমী তার ওপর শোবার তোড়জোড় করতে লাগল। ডাক্তারবাবু তখন উঠে মেয়েটির আবার নাড়ী দেখছেন। সমীরণও সেখানে দাঁড়ানো। লোমী আড়চোখে ওদিকে তাকালো কয়েকবার। তার সঙ্গে ঘরের

অবস্থানটাও আরো ভাল করে দেখে নিল। ওর বিছানা আর মেয়েটির শয্যার মাঝে একটিই শুধু বাধা সেটা ওই টেবিল। তাছাড়া সামনে উন্মুক্ত কার্পেট। ব্যবধান খুব বেশী নয়।

ডাক্তারবাবু ফিরে গেলেন তার বিছানায়। সমীরণও তার ম্যাট্রেসের ওপর এল। ওদের দুজনের চেহারা একবার লক্ষ্য করে লোমী ঢুকে পড়ল ওর স্লিপিং ব্যাগে। চেনটা টানতে টানতে বলল, আপনাদের এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমি খুব লজ্জিত। আচ্ছা শুভরাত্রী! শুয়ে পড়ল লোমী। ডাক্তারবাবু শুভরাত্রি বলে তার ঘড়ির এলার্মে কিছু পরিবর্তন করে বাতিটা নিভিয়ে দিলেন।

ঘরে আবার অন্ধকার নেমে এল।

সেই অন্ধকারে দুজন আবার ঘুমোনোর চেষ্টা করলেও লোমী তখন চোখ দুটো পুরোপুরি মেলে তাকিয়ে আছে। এখন সে এভাবেই তাকিয়ে থাকবে শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষায়। সেই সুযোগ একঘণ্টা পরেও আসতে পারে আবার তিন ঘণ্টা পরেও। মোট কথা লোমী এখন নিশ্চিন্ত। ওর হাতে মেয়েটির মৃত্যু হতে আর বেশী দেরী নেই। এই ঘরে ঢোকাব মত সবচেয়ে কঠিন কাজটাই যখন হয়ে গেল বাকীটুকু তো খুবই সহজ। ওরা দুজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেই শুধু একবার উঠে মেয়েটার নাক শক্ত হাতে চেপে ধরতে হবে। ব্যস, প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতা নেই ওর। চীৎকার করারও সামর্থ্য নেই। নিমেষে দম বন্ধ হয়ে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। তারপর লোমী ওর নেকলেসের লকেটটা খুলে বার করে নেবে আসল জিনিসটা। ওদের দলের যেটা বলতে গেলে মরণকাঠি। ওটা নিয়েই আবার লোমী শুয়ে পড়বে বিছানায়। কিসসা খতম। সন্দেহের কারো কিছু থাকবে? ডাক্তারবাবুরও আশঙ্কা মেয়েটির মৃত্যু যখন-তখন হতে পারে। সেটা দুর্ভাগ্যবশত খাতিতেই হল।

লোমী নিথর নিশ্চল শায়িত সাপের মত কান পেতে রইল মাটিতে। সঙ্গী দুজনের ঘুমিয়ে পড়ার কোনো আঁচ যদি পাওয়া যায়। নিস্তব্ধ ঘরে তখন ওর হাতের ঘড়িটাই টিকটিক করছে। নিঃশব্দে হাতখানা বের করে লোমী দেখল। রেডিয়াম ডায়ালে এখন বাজে এগারোটা পঞ্চাশ।

আমেরিকা। ওয়াশিংটন শহর।

ভারতবর্ষে এ সময় মাঝরাত হলেও এখানে এমূহূর্তে দিন। এখন সকাল

দশটা। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রখ্যাত বাসস্থান হোয়াইট হাউসের সদর দরজার কড়া সিকিউরিটি চেক পেরিয়ে একটা বিশাল বিলাসবহুল গাড়ি ঢুকল ভেতরে। এই গাড়িতে বসে আছে তরুণ সিনেটর হ্যারল্ড রজার। স্পষ্ট বক্তা, প্রগতিবাদী ও নির্ভীক সিনেটর হিসেবে সারা আমেরিকায় সে ভীষণ জনপ্রিয়, প্রশংসার পাত্র তো বটেই। সেই জন্যই এক বছর হল প্রেসিডেন্ট তাকে একটি বিশেষ কাজের দায়িত্ব ভার দিয়েছেন। কাজটা খুবই গোপনীয়। একমাত্র প্রেসিডেন্ট ও রজার ছাড়া এই কাজের বিবরণ সারা আমেরিকায় মাত্র গুতিকতক লোক জানে। যাদের সাহায্য ছাড়া রজার এই কাজ সম্পন্ন করতে পারবে না। তবে তারাও খুবই দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত লোক।

প্রেসিডেন্ট রজারকে নিয়োজিত করেছেন আমেরিকার কুখ্যাত মাফিয়া-দল ও গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন জঘন্য অপরাধের অতি গোপনীয় এক তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে। এই সব অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে অজস্র খুন-খারাপী। বহু লুঠতরাজ, অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র। বলা বাহুল্য মাফিয়ারা হল আমেরিকার প্রভাবশালী দল। তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অপরিসীম। এই শক্তির আড়ালে রয়েছে যেমন বহু সরকারী ও বেসরকারী ভি. আই. পির পৃষ্ঠপোষকতা তেমনি অজস্র সাধারণ মানুষেরও যোগাযোগ। এই পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগাযোগগুলো তারা আদায় করে তাদের আধিপত্যে যে প্রভূত সম্পত্তি ও ধনরাশি রয়েছে তার সাহায্যে। এইসব কারণেই এদের বিরুদ্ধে কেউ কখনো সত্যিকারের কোনো অনুসন্ধান বা প্রতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু রজার এ ব্যাপারে বদ্ধ-পরিকর। কোনো বাধা বা বিরোধ সে মানবে না। মাফিয়াদের প্রভাব ও প্রতাপ দেশ থেকে সে নির্মূল করবেই। এবং সেজন্য সে গত একবছর নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও অনলস অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। কয়েক-জন বিশ্বাসী ও অকপট কর্মীর সাহায্যে চালিয়ে গেছে গোপন নিভৃত তদন্ত। এবং এই দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সে সত্যি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রমাণ। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই যে প্রকাশ্য তদন্ত কমিশন বসবে তার সামনে এই তথ্য-প্রমাণগুলো পেশ করা হলে দেশের ফেডারেল আইন দ্বারা এদের জঘন্য কার্যকলাপের ইতি করতে তখন আর কোনো বাধা থাকবে না। আজ পর্যন্ত যা কেউ করতে পারে নি।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই গোপন তদন্তের রিপোর্ট নিয়েই আজ বসার কথা রজারের। অবশ্য এই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল আরো কয়েকদিন আগে। কিন্তু রজারই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে তা বাতিল করে দিয়েছিল। আজকের সাক্ষাত পুনর্নির্ধারিত।

তার কয়েক মিনিট পরের কথা।

একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রেসিডেন্ট আর রজার এখন মুখোমুখি বসে। মাঝখানে বিশাল টেবিল। এক ঝাঁক টেলিফোন। পেন পেনসিল কাগজ টেপরেকর্ডার ভিডিও। দামী আসবাব-পত্র কার্পেটে সুসজ্জিত এই বিরাট কামরায় আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

প্রেসিডেন্টের সময় খুব মাপা। খুব চটপট কথা-বার্তা সেরে নিতে হবে। তাই কোনো ভূমিকা না করেই শুরু করল রজার—প্রেসিডেন্ট এই তদন্ত নিয়ে আমরা খুব বিপাকে পড়েছি। গতবার আমি যে কারণে আপনার সঙ্গে বৈঠক বাতিল করেছিলাম সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন এখন পর্যন্ত হয়নি।

—আমি তা আন্দাজ করতে পেরেছি রজার। প্রেসিডেন্ট ভরাট স্বরে বললেন, তুমি আমায় সংক্ষেপে সব খুলে বল।

—তদন্ত আমার পুরোপুরি শেষ। আমি সফলও হয়েছি। এই দলের প্রতিটি কার্যকলাপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যা জেনেছি তা প্রকাশ হলে নরকের সম্রাটও শিহরিত হয়ে উঠবে। কিন্তু দুঃখের কথা প্রেসিডেন্ট এই দীর্ঘ অমানুষিক পরিশ্রম করে যে তথ্য প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি সব আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট একবার নিথর দৃষ্টিতে তাকালেন রজারের চোখের দিকে। তারপর উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন, কি করে হল? তুমি কি ওগুলোর পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা নাওনি?

—তার আগেই যা ঘটার ঘটে গেছে।

—কি রকম?

—আপনি তো ভাল করেই জানেন প্রেসিডেন্ট। রজার বিনম্র স্বরে বলল, মাফিয়াদের ভূত কোথায় যে নেই কেউ বলতে পারে না। আমি এর ছোঁয়াচ থেকে আমার সব কর্মীদের বাঁচিয়ে রাখার যারপর নাই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কি করে যে কি হল কিছু বুঝতে পারছি না। শেষ

মুহূর্তে দেখলাম আমার দলের একজন তদন্তকারী অফিসার একেবারে উধাও। তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। তার ওপর ভার ছিল ওই সব সংগ্রহিত দলিলগুলো একত্র করে তার ছটি মাইক্রো-ফিল্ম তুলে রাখার। তার তিনটি কপি দেশের বিভিন্ন জায়গায় অতি নিভৃতে লুকিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমার পাকা ছিল। এক কপি আমার মারফতে যাওয়ার কথা সুপ্রীম কোর্টে। আরেক কপি আমি নিজেই রাখতাম। ওই তদন্তকারী অফিসার আমার নির্দেশনুযায়ী সুদূর ওহিওতে গিয়ে একটি অখ্যাত স্টুডিওতে এই ফিল্মগুলো তোলার ব্যবস্থা করেছিল। আমি নিরাপত্তার খাতিরেই ওগুলো ওয়াশিংটন বা অন্য বড় শহরের বড় বড় স্টুডিওগুলোতে পাঠাইনি। এমনকি মাফিয়াদের ভয়ে ওগুলো ওই স্টুডিও থেকে সংগ্রহ করার ভার দিয়েছিলাম আরেকজনের ওপর। কিন্তু তার আগেই সর্বনাশটা ঘটে গেল। ওই তদন্তকারী অফিসার ওহিও থেকে ফেরার পরেরদিনই উধাও হলেন। তার পরের দিন হামলা হল ওহিওর ওই স্টুডিওর ওপর। মাইক্রোফিল্ম ও সব দলিল-পত্রগুলো ওরা একেবারে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। তছনছ করে দিয়েছে স্টুডিওটার সব কিছু। কিন্তু স্টুডিওর মালিক এ নিয়ে পুলিশকে কিছু জানায়নি। সে জানাতেও চায় না।

প্রেসিডেন্ট সব শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাতে হাত ঘসে তারপর ঘাড় উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, কি ছিল তোমার ওই দলিলে?

—ওদের বেকায়দায় ফেলার মত সব কিছুই ছিল, প্রেসিডেন্ট। ওদের বিভিন্ন খুন-খারাপী ষড়যন্ত্রের তারিখ, স্থান ও সেগুলোর সঙ্গে জড়িত ওদেরা সব সদস্যের নাম। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ওদের যার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত তাদের নাম ঠিকানা সহ সম্পূর্ণ ইতিহাস ও সবচেয়ে বড় কথাওদের অধিকারে যে বিপুল ধনসম্পত্তি আছে তার বিশদ বিবরণ। তার মধ্যে দেশের কয়েকশ ব্যাঙ্কের একাউন্ট নাম্বার ও অজস্র লকারের হদিশ থেকে শুরু করে ওদের মালিকানায় ও অংশীদার ভূক্ত প্রায় প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামও ছিল।

প্রেসিডেন্ট এবার আরো বিচলিত হলেন। এই তথ্য গুলো যে মাফিয়া-দলের পতনের কারণ হত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এগুলো সংগ্রহ করা যে কতটা দুঃসাধ্য কাজ তাও তিনি জানেন। হয়ত ভবিষ্যতে আর কখনো এসব যোগাড় করা যাবে না।

রজার একটু থেমে সব শেষে বলল, এখন একটি মাত্র ক্ষীণ আশা আছে প্রেসিডেন্ট। যদিও সেখানেও কিছু অনিশ্চিতি এসে গেছে। তাহলেও ওই ছ কপি মাইক্রো-ফিল্মের এক কপি হয়ত আমরা পেলেও পেতে পারি?

—কি ভাবে? প্রেসিডেন্টের প্রশ্নসূচক দৃষ্টি।

রজার পায়ের ওপর পা তুলে বলল, আমি এইসব ঝুঁকির কথা ভেবেই এক কপি মাইক্রো-ফিল্ম বেসরকারী পর্যায়ে এমন একজনের কাছে রাখতে চেয়েছিলাম যার কথা কেউ ভাবতেও না পারে। তিনি হলেন ওহিওর একজন ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জোফিল্ড। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। আমি তাঁর মেয়েকেই আমার অনুসন্ধানের সব দলিল-পত্র টাইপ করার কাজে লাগিয়েছিলাম। কাজটা খুব গোপনে করার জন্য এর চেয়ে বিশ্বাসী ও নির্ভর-যোগ্য সুযোগ আর ছিল না। মেয়েটি ছিল খুব সাদা-সিধে ও রুচিবান্। চিন্তাধারা বাবার মতই প্রগতিশীল। রেভারেণ্ড তো সুস্থ সমাজের স্বার্থে মাফিয়াদের ধ্বংস আমাদের চেয়েও বেশি করে চান। একমাস আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ওয়াশিংটনে। তখন তাঁকে সব খুলে বলে তাঁর মেয়েকে টাইপের জন্য ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ও ওই মাইক্রো-ফিল্মগুলোর এক কপি অতি গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি রাজী হয়েছিলেন। সে অনুযায়ী তাঁকে আমি ওহিওর ওই স্টুডিওর নামে একটা চিঠি দিয়ে রেখেছিলাম। স্টুডিওর মালিককেও সেভাবে বলা ছিল ওই চিঠি নিয়ে যে আসবে তাকে এক কপি মাইক্রো-ফিল্ম দিয়ে দিতে। রেভারেণ্ড জোফিল্ড সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই সেটি নিয়েছিলেন। কারণ তার কয়েকঘণ্টা পরেই মাফিয়ারা সেই স্টুডিওতে হামলা করে।

—তারপর? প্রেসিডেন্ট রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন।

রজার একটু বিরতি নিয়ে বলল, আমার যতদূর ধারণা এই মাইক্রো-ফিল্মটির কথা মাফিয়ারা জানে না। হয় স্টুডিওর মালিক তাঁদের এ সম্বন্ধে কিছু বলেনি অথবা বললেও তারা এখনও হদিশ করতে পারেনি যে সেদিন রাতে কে ওই মাইক্রো-ফিল্ম সেখান থেকে নিয়ে গেছে। তাঁর কারণ রেভারেণ্ড মাফিয়াদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল। তিনি সেদিন ছদ্মবেশে ও খুব সতর্ক হয়ে ফিল্মটি নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারপর তাঁর অতি সাবধানতা এই মাইক্রো-ফিল্মকে আমাদের নাগালের প্রায় বাইরে নিয়ে গেছে।

—কি রকম ?

—রেভারেণ্ডের আশঙ্কা ছিল মাফিয়ারা যে কোনো সূত্রে খবর পেয়ে যে কোনো মুহূর্তে ওই ফিল্মের সন্ধানে তার বাড়িতেও হানা দিতে পারে। তাই তিনি ওটা একটা নেকলেসের লকেটে পুরে তার মেয়ের গলার হারে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়ে তার কাছে থাকে না। থাকে এই ওয়াশিংটনেই। এখানে চাকরী করে। অবশ্য এসব নিয়ে মেয়েকে তিনি কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছিলেন এই হার যেন সে কখনো গলাছাড়া না করে। কিন্তু ওই মেয়ে আবার পাহাড়-প্রেমী। বাবা যেদিন তার গলায় হারটা পরান তার তিনদিন পরেই ওর যাওয়ার কথা ভারতবর্ষে হিমালয়ের কোনো শৃঙ্গে আরোহণ করতে। রেভারেণ্ড এসব ব্যাপারে বিশেষ খবর রাখেন না। মেয়ে যথারীতি বেরিয়ে গেল। এবং আমাদের সবচেয়ে সর্বনাশের কথা এবং রেভারেণ্ডের চরম দুঃখের কথা, সে সেই পাহাড়ে গিয়ে আরো চারজন অভিযাত্রীর সঙ্গে প্রাণ হারালো। আরো কি বলব—রজার করুণভাবে হাসল এবার। একটু কেসে বলল, বরফের পাহাড় ধসে মারা গেছে সব। সেই পাঁচটি মৃতদেহের মধ্যে মাত্র দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনটি দেহের এখনো কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। তার মধ্যে একটি রেভারেণ্ডের মেয়ের। এই মেয়েটির নাম হয়ত আপনার কানেও এসেছে—লিন জোফিল্ড। অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির জন্য যাকে ওয়াশিংটনের হিউম্যান কমপিউটার বলা হয়।

—তাই নাকি !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশাল বিশাল অঙ্ক ও নানা ধরনের তথ্য সে তার মগজে দীর্ঘদিনের জন্য ধরে রাখতে পারে। ঠিক যেমন কম্পিউটারে থাকে। সম্প্রতি দু দুটো প্রেস কনফারেন্সে এরকম কৃতিত্ব সে দেখিয়েছে। আমার পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলো টাইপ করার জন্য ওকে নেওয়ার মূলে এটাও একটা কারণ। ভেবেছিলাম যদি আমার দলিল-পত্রের কখনো কোনো দুর্গতি হয় তাহলে এই মেয়েটির স্মৃতিশক্তি থেকেও আমরা তার কিছুটা অন্তত উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু আমাদের সবদিক দিয়েই দুর্ভাগ্য। মেয়েটিও মারা গেল সঙ্গে উধাও হল ওই একমাত্র মাইক্রোফিল্মটাও।

—বুঝলাম। প্রেসিডেন্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, মাইক্রোফিল্ম

আর এই মেয়েটিকে একসাথে রাখাই ভুল হয়েছে। যাই হোক, ওই মাইক্রো-ফিল্মটা যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এই লাশ উদ্ধারের ব্যাপারে কতটা কি করেছ ?

—মাফিয়াদের জন্য আমি সরাসরি কিছু করতে পারছি না, প্রেসিডেন্ট। রজার ঝুঁকে বলল, কারণ আমি যে ওদের নজরে পড়ে গেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মাইক্রোফিল্মের খবরটা ওরা যদি পেয়ে যায় তাহলে এই শেষ সম্বলও আমাদের খোয়াতে হবে। তবে ওহিও এল্পাইন ক্লাবের সঙ্গে আমি অন্য একজনের মারফত খুব গোপনে যোগাযোগ রাখছি। ওরা খুব শীঘ্রই একটা রেসকিউ-টিম পাঠাচ্ছে ওই পাহাড়ে। সেই টিমে আমাদের তরফ থেকে এফ. বি. আইয়ের একজন অফিসার থাকবে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থাটাও খুব গোপনে করা হয়েছে। আমাদের এখনই হৈচৈ করে কিছু করা উচিত না। লাশটা যদি তারপরেও না পাওয়া যায় তখন ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর আরো কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলে বৈঠকের ইতি হল। রজার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

ধীরে ধীরে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বাঁ হাতটা বের করে ঘড়িটা আবার দেখল লোমী। একটা কুড়ি। এ মুহূর্তে ঘরের মধ্যে কম্পাউণ্ডারের নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। ডাক্তার কিন্তু ওদিকে নিশ্চল নিথর। ঘণ্ট্যখানেক আগেও তার নড়া-চড়ার শব্দ শোনা গেছে। খুব উসখুস করছিলেন ভদ্রলোক। এখন তার একটানা নিশ্বাস নেওয়ার মৃদু শব্দটাই ভেসে আসছে কানে। দুজনেই যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোমী স্লিপিং ব্যাগের চেনটা খুলল আস্তে আস্তে। তারপর উঠে বসল বিছানায়।

চারপাশের অন্ধকারটা কিন্তু আবছা এখন। বাইরে প্রায় পূর্ণ চাঁদ। জানলার কাঁচগুলো দিয়ে তার কিছু আভা আসছে ভেতরে। সেই আভায় স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে কোন দিকে কি রয়েছে। দু-তিনবার কাশল লোমী। স্লিপিং ব্যাগের খসখসে শব্দটা ভাল ভাবেই করল। কিন্তু না কম্পাউণ্ডার বা ডাক্তার কারো তরফে কোনো কিছু পরিবর্তন হল না। স্লিপিং ব্যাগ থেকে পা দুটো সন্তর্পণে বের করে এবার সে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বেশী আর সময় নেওয়া চলবে না। যা করতে হবে চটপট। লোমী পকেট থেকে গ্যাস-লাইটার বের করে 'ফস্' করে জ্বালাল। ডাক্তার অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। কম্পাউণ্ডার সোজাসুজি কড়ি কাঠের দিকে মুখ করে। প্রত্যেকেই যেমন কে তেমনই রইল। লোমী লাইটার নিভিয়ে এগিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই কম্পাউণ্ডার হঠাৎ নাক ডাকা বন্ধ করে পাশ ফিরল। তড়িৎবেগে যেখানে ছিল লোমী সেখানেই বসে গেল। ওর পেছনে কাঁচের জানলা। কম্পাউণ্ডার একবার চোখ খুললে ওর দাঁড়ানো ছায়াটা দেখে চমকে উঠতে পারে।

বসেই অতি সাবধানে বিছানার দিকে পেছিয়ে এল লোমী। একেবারে নিঃশব্দে। কম্পাউণ্ডার ছট্-ফট করছে বিছানায়। প্রলাপের মত কি যেন বিড়বিড় করল। তারপর আবার আস্তে আস্তে নাক ডাকা শুরু হল। লোমী একটু অপেক্ষা করল। অন্ধকারে শিকারী নেকড়ের মত ওত পেতে বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর আবার উঠল।

এবার আর কোনো দিকে দেখা নয়—পা টিপে টিপে নিঃশব্দ সরীসৃপের মত মেয়েটির শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। টেবিলের আড়ালের জন্য এপাশে কিছু দেখা যায় না। জমাট অন্ধকার। দ্রুতবেগে পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বের করে দেখে নিল একবার। সরু আলোর রেখা গিয়ে পড়ল মেয়েটার চিবুকে। সারা দেহ কম্বলে ঢাকা। শুধু মাথা থেকে ওই পর্যন্ত খোলা। আরেকটু সরে নিঃশব্দে মাটিতে উবু হয়ে বসল লোমী। বাঁ হাতে টর্চটা নিয়ে ডান হাতে গলার দিক থেকে কম্বলটা তুলল আস্তে আস্তে। টর্চের সরু আলোয় হার লকেট সব চকচক করে উঠল। কিন্তু গলায় মরণ থাবাটা বসানোর আগে একবার শুধু দেখে নিতে হবে এই তো সেই মেয়ে। লোমী সেটা যাচাই করার জন্য হারের লকেটটাই হাতে তুলে নিল আগে। টর্চের আলো ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কয়েকবার। তারপর নিঃশব্দে এদিক-ওদিক মোচড় দিতে শুরু করল। প্রথমে কিছুই হল না। কিন্তু পরে চারধারে ঘড়ির মত খাঁজ দেখে পকেট থেকে ছুরি বার করে ঘোরাতেই প্যাঁচ খুলে বেরিয়ে এল তলার গোল ঢাকনাটা। লোমীর চোখ সঙ্গে-সঙ্গে চক-চক করে উঠল। ভেতরে সরু রীলে মোরা ক্যাসেটের টেপের মত গোটানো সরু মাইক্রো ফিল্ম। রীলটা হাতে নিতেই উত্তেজনায় সারা শরীরে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে

গেল। এ হল ওদের মরণ কাঠি। চটপট ওটা পকেটে পুরে ঢাকনাটা আবার লাগাল লোমী। আর তারপরেই ঘরে একটা অঘটন ঘটে গেল। লোমীকে একেবারে অপ্রস্তুত করে দিয়ে টেবিলের এক কোণে রাখা কোনো ঘড়ির এলার্ম হঠাৎ টি টিং করে বাজতে শুরু করল। লোমী মুহূর্তের জন্য নিথর। তারপরেই নিজের সঙ্গীন অবস্থাটা বুঝতে পেরে দ্রুত হাতে আবার কম্বলটা মেয়েটির গলা পর্যন্ত ঢেকে পেছিয়ে এল খাট থেকে।

কিন্তু তার আগেই ঘরের অন্য দুজন প্রাণী জেগে আছে। ডাক্তারবাবু বিছানায় নড়ে-চড়ে বললেন, সমীরণ।

সমীরণ আড়মোড়া ভেঙে সাড়া দিল, হ্যাঁ দাদা

লোমী ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে টেবিলের দিকে উবু হয়ে এসে উঠে দাঁড়াল। ডাক্তারবাবু এবার সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কে?

লোমী হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে বলল, আমি ডাক্তার। পেটের ব্যাথাটা আবার হচ্ছে। ওষুধ তো ও ঘরে। তাই এখানে ওষুধ খুঁজছি।

ততক্ষণে সমীরণও উঠে গেছে। স্লিপিং ব্যাগ থেকে টর্চ হাতে বেরিয়ে এসে বলল, ঠিক আছে আমি দিচ্ছি ওষুধ। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

সমীরণ টেবিলের মোমবাতিটা জ্বালাল। লোমী সম্পূর্ণ চুপসে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জীবনে এতটা হতাশ সে কখনো হয়নি। একটুর জন্য এ মূহূর্তে বেঁচে গেল মেয়েটা। কিন্তু হতচ্ছাড়া ঘড়িটা তখন বেজে উঠল কেন? চোখ-মুখ খিঁচিয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল লোমী।

সমীরণ টেবিলের ওপর রাখা একটা বোঁচকা থেকে ট্যাবলেট বের করে ওকে দিতে এল। লোমী ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা ঝোড়ো নিশ্বাস ছেড়ে হাত বাড়িয়ে নিল ট্যাবলেটটা। সমীরণ এবার এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। মাঝ-রাতে স্নায়ুর অবস্থা দেখার কথা। প্রায় মৃত্যুশয্যায় বলেই ওকে কিছুক্ষণ অন্তর লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। তাই মাঝ রাতের জন্য ডাক্তারবাবু এই এলার্মের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মেয়েটির নাড়ী পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু আর সমীরণ আবার শুয়ে পড়লেন। সমীরণ ঘুমিয়ে পড়েছিল তার কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু ডাক্তারবাবুর চোখে আর ঘুম নেই। মেয়েটির স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি বাকী রাতটুকু জেগেই কাটালেন। লোমী সেটা টের পেয়েছিল। তাই কোনো

কম সুযোগ নেবার চেষ্টা করল না আর। আপাতত মাইক্রো ফিল্মটা হাতড়েই দ মনে-মনে একটু সন্তুষ্ট থাকল। মেয়েটিকে হত্যা করার কথা আবার কাল াবা যাবে।

থারীতি পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ ডাক্তারবাবুর ফেরার যাত্রা শুরু ল। এবার বিশাল তাঁর দল। তাঁর নিজের দুজন কুলি ছাড়াও মেয়েটির শয্যা য়ে নিয়ে যাবার জন্য রয়েছে আরো চারটি কুলি। তার ওপর লোমী ও তার লী। সব নিয়ে মোট দশজন।

খাতির মুখিয়াজী সহ আরো বহু লোক ডাক্তারবাবুকে বিদায় জানাতে াসেছিলেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকজন কিছুদূর অব্দি এগিয়েও দিলেন।

সামনে তরাইয়ে নেমে সাঁকো অব্দি এসে ফিরে গেল সব। তারপর ওরাই ন্থর গতিতে এগিয়ে চলল।

মেয়েটির জন্যই গতির মন্থরতা। এই চড়াই উতরাইয়ের পথে তাকে খুব াবধানে নিয়ে যেতে হবে। তাই একেবারে সামনে চারটে কুলির কাঁধে রয়েছে ার শয্যা। পেছনে ডাক্তারবাবু সমীরণ ও লোমী। আর তিনজন কুলি বশ্য তাদের স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গেছে। ওরা মাল পিঠে নিয়ে আস্তে াটতে পারে না।

লোমী হাঁটছে একটু চিন্তিত পদক্ষেপে। যদিও আজ সকালে বাংলোর াথরুমে মাইক্রো ফিল্মটাকে লাইটারের শিখায় 'একেবারে ছাইয়ে পরিণত রে অনেক নিশ্চিন্ত ওর মন। তাহলেও মেয়েটিকে শেষ করতে না পারলে ুরোপুরি নিশ্চিন্তি কিছুতেই আসবে না। তাই ওর মনে এখন অহরহ চিন্তা াজ রাতের মধ্যে মেয়েটিকে কিভাবে হত্যা করা যায়। ব্যাপারটা এমন কিছু ঠিন নয় তাহলেও গত রাতে ও ভাবে শেষ মুহূর্তে বিফল হওয়ায় একটু বিচলিত হয়ে উঠেছে ওর মন। কারণ আজ রাতেই শেষ সুযোগ। ডাক্তার াবুর যা কার্য্যসূচি সে অনুযায়ী কাল রাতের মধ্যেই তিনি ভারারি হাসপাতালে পৌঁছবেন। আজ থাকার কথা ঢাকুরীতে। কাল ঢাকুরী থেকে লোহারক্ষেত পেরিয়ে একেবারে সেই ব্রীজ পর্যন্ত যাবেন। তারপর থেকে গাড়ি যায়। ওখানে আগামী কাল ট্যাক্সি আনার জন্য দুজন কুলী আজ ঢাকুরীতে না থেকে একেবারে লোহার ক্ষেত চলে যাবে। তারপর সেখান থেকে ভোরে

বেরিয়ে ভারারি। তারা বিকেলের আগেই ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছবে। অতএব যা করার আজ রাতেই করা চাই। সুযোগ বিন্দুমাত্র এলেও আর একদম হাত ছাড়া করা চলবে না।

কিন্তু সে সুযোগ যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে একথা একবারও লোমী ভাবতে পারেনি। তখন ঘণ্টা চারেক প্রায় কেটে গেছে। এগারোটা বাজতে আর মিনিট দশেক মাত্র বাকী। তবে এতটা দীর্ঘ সময় কাটলেও মাঝে-মাঝে বিশ্রাম আর শম্বুক গতির জন্য পথের এখনো এক তৃতীয়াংশ বাকী রয়ে গেছে। মাঝখানের সাঁকো আর জঙ্গলের মত এলাকাটা পেরিয়ে এবার চড়াই শুরু। এ চড়াই দোয়ালী পর্যন্ত উঠবে। ঢাকুরী তিন কিলোমিটার লেখা মাইল স্টোনের কাছে আসতেই লোমী দেখলো তিনটি লোক রাস্তার পাশে বসে। তারা ডাক্তারবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তিনজনেই স্থানীয় কোনো গ্রামের বাসিন্দা। মাঝ বয়েসী। সবার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ।

ডাক্তারবাবুর দিকে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল ওরা। —বাবুজী আপনার অন্যই আমরা পথ চেয়ে বসে আছি। ওদের মধ্যে একজন ঝুঁকে অতি নম্র স্বরে বলল।

ডাক্তারবাবু থেমে বললেন—কেন, কি হল ?

—আমার ছেলের মর-মর অবস্থা বাবুজী। আপনি না দেখলে ও নির্ঘাৎ মারা যাবে। বলতে বলতে লোকটির চোখের কোণে জল এসে গেল।

ওরা যা বলল তাতে বোঝা গেল ছেলেটির নিউমোনিয়া হয়েছে। গত পরশু নাকি ঠিক ছিল ওকে খাতিতে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু অবস্থা এতই খারাপ এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলে পথেই মারা যেতে পারে ভেবে নিয়ে যায়নি। তখন ওরা ঠিক করেছে ডাক্তারবাবুকে ফেরার পথে ধরবে। এই একটু নীচে ওদের গ্রাম। ছেলের বাবা পূব দিকের ঢালে হাতের ইশারা করে মিনতি করে বলল, নজদীগ বাবুজী। আধা ঘণ্টা লাগবে।

ওদের আধঘণ্টা মানে ডাক্তারবাবুর পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো বটেই। তারপর ফেরাটা চড়াই। তার মানে যাওয়া-আসা সব মিলিয়ে কম করে ঘণ্টা দুয়েক। ডাক্তারবাবু ভাবলেন একটু। ভাবনা অবশ্য এমুহূর্তে শুধু সঙ্গী মেয়েটিকে নিয়ে। তা নাহলে এই সব অঞ্চলে এরকম ডাক শুনে ডাক্তারবাবু উপেক্ষা করবেন এরকম মানুষ তিনি নন। কিন্তু এদিকে প্রায় মৃত্যু-শয্যায় শায়িত

মেয়েটিকেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই খোলা আবহাওয়া থেকে সরিয়ে ঢাকুরী বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে।

সব ভেবে-চিন্তে, বিশেষ করে সেই রূপকুণ্ডে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুটির মর্মান্তিক পরিণামের কথা মনে করে ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন এখন একবার তিনি ছেলেটিকে দেখেই আসবেন। তবে আর সবাই মেয়েটিকে নিয়ে যথারীতি এগিয়ে যাক। ভাবামাত্র ডাক্তারবাবু আরেকবার মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখলেন। অবস্থা একই। সমীরণকে নির্দেশ দিলেন বাকী পথে কি হলে কি করতে হবে। লোমীকেও অনুরোধ করলেন মেয়েটিকে সাবধানে নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর কিছু ওষুধ-পত্র ও ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম তিনজন গ্রামবাসীর হাতে দিয়ে তিনি রওনা হলেন নীচের গ্রামের উদ্দেশ্যে। সমীরণ অবশ্য তার আগে তাদের বারবার করে বলে দিল ডাক্তার-বাবুকে ঢাকুরী অবধি সাবধানে পৌঁছে দিতে। তারা তিনজনেই মাথা হেলিয়ে সমীরণকে নিশ্চিন্ত করে গেল, কোনো চিন্তা নেই। ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে একেবারে ঢাকুরী বাংলো অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ডাক্তারবাবু বাঁদিকের ঢালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ওরাও আবার চলতে শুরু করল। সেই সামনে সামনে চারটে কুলি ও পেছনে সমীরণ ও লোমী।

লোমী তখনও ভাবতে পারেনি যে কি অমোঘ সুযোগ পাচ্ছে ও কিছুক্ষণের মধ্যে। ঘটনাটা ঘটল তার ঠিক ঘণ্টা খানেক পর। চড়াইয়ের রাস্তায় চলতে চলতে একটু বিশ্রামের জন্য থামল ওরা। কুলি চারজন মেয়েটির শয্যা নামাল রাস্তার এক পাশে। সমীরণ রুটিন মাফিক ওর হাত খানা তুলে নাড়ীর স্পন্দন দেখে নিল একবার। নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুরে লোমীকে বলল, সায়েব দশমিনিটের জন্য একটু ওর পাশে বসো। আমি আসছি।

বলেই নিজের কাঁধের হ্যাভার স্যাক থেকে টয়লেট পেপার নিয়ে সে রাস্তার ডানপাশের ঝোপের দিকে পা বাড়াল। লোমী বুঝল প্রকৃতির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে ওর মগজে খেলে গেল ব্যাপারটা। তাই তো, এই সময়ে ওই চারজন নির্বোধ কুলি ছাড়া আর কেউ যে নেই কাছাকাছি। এই সুযোগ কি হারানো উচিত। দশ মিনিট যথেষ্ট সময়। এই মরণোন্মুখ মেয়েটিকে হত্যা করতে মিনিট খানেকও লাগবে কিনা সন্দেহ। ভাবামাত্র লোমী ওর পকেট থেকে

দামী সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। তারপর কুলি চারজনের দিকে ওটা দেখিয়ে ইংরেজিতে বলল, খাবে নাকি ?

বিদেশী সিগারেট দেখে চোখ মুখ ওদের জ্বলজ্বল করবেই।

লোমী চারটে কিং সাইজ সিগারেট ওদের দিকে এগিয়ে দিল। ওরা পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে হাত বাড়াল।

লোমী তারপর মেয়েটিকে দেখিয়ে ইশারা ও ভাব ভঙ্গীতে বোঝাল, এই সিগারেট ওর পাশে খাওয়া ঠিক নয়। গন্ধ পর্যন্ত নাকে গেলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে। বলে লোমী একটু দূরের বড় একটা পাথর দেখিয়ে বলল, ওর আড়ালে গিয়ে খাও। ওরা আনন্দে বাধ্য ছেলের মত সেদিকে চলে গেল।

লোমী ওদের যাওয়ার দিকে তাকাল একবার। তারপর মেয়েটির দিকে। পেছন ফিরে ঝোপটাও দেখে নিল সে ভাল করে যার আড়ালে সমীরণ গেছে। ব্যস আর এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট নয়। এখনই যা করার করে ফেলতে হবে। লোমী ঘুরে দাঁড়াল। কুলী চারজন ততক্ষণে পাথরের আড়ালে গিয়ে বসেছে। এখন শুধু মেয়েটি ও লোমী পাশাপাশি। লোমী এক মুহূর্তের জন্য সারা শরীর শক্ত করে পরক্ষণে সহজ হয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

—সায়েব !

মেয়েটির গলার ওপর ঝুঁকে পড়তে গিয়ে হঠাৎই যেন ধাক্কা খেলো লোমী। চমকে পেছন ফিরে তাকাল। একটি লোক রাস্তায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—সায়েব ! লোকটা আবার হিন্দিতে বলল, কটা বাজে এখন ?

লোমী ওর হিন্দী কথা বুঝতে পারল না। তবে মেজাজ পুরোপুরি বিগড়ে গেল। একেবারে শেষ মুহূর্তে কি করতে এল এই লোকটা। ভেতরের রাগ কোনো মতে সামলে ইংরেজীতেই সে বলল, আমি কিছুই জানি না। আমি নবাগত এখানে।

লোমী ভেবেছিল লোকটা এবার চলে যাবে। তারপরেই সে কাজটা সেরে নিতে পারবে। কিন্তু ওকে পুরোপুরি হতাশ করে লোকটা বসে পড়ল রাস্তার পাশে। লোমী দাঁতের ওপর দাঁত চেপে আগুন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু আগন্তুকটি তখন নির্বিকারে জিরোচ্ছে। তখনই হঠাৎ ওর চোখে চোখ রাখতে গিয়ে চমকে উঠল লোমী। একে কোথায় যেন সে

দেখেছে! স্থানীয় লোক। পরণে ময়লা মোটা পাতলুন। গায়ে ছেঁড়া রাফ উলের সোয়েটার। মাথায় মাফলারের মত কাপড়ের একটা পট্টি বাঁধা। কিন্তু কোথায় যে এর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে কিছুতেই লোমী মনে করতে পারল না। বাধ্য হয়ে যে ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

তার একটু পরেই সমীরণ এল সেই ঝোপের আড়াল থেকে। হন্ত দন্ত হয়ে এসে প্রথমেই দেখল মেয়েটির শারীরিক অবস্থা। নাড়ীর স্পন্দন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে কুলীদের খোঁজে তাকাল এদিক ওদিক। কিন্তু ওদের আশে-পাশে না দেখে সমীরণ যেন একটু ঘাবড়ে গেল। লোমীর সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। হতাশ লোমীর তখন বাক রুদ্ধ অবস্থা। কি করবে বা কি বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। ওদিকে সেই আগন্তুকটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর সঙ্গী এসে গেছে পেছন থেকে। ছুজনেই সমবয়সী। ওরা আবার হন হন করে এগিয়ে গেল সামনে। ততক্ষণে কুলী চারজনও পাথরের আড়াল থেকে এসে হাজির। অর্থাৎ লোমীর দ্বিতীয় সুযোগও ব্যর্থ হল।

ঢাকুরী পর্যন্ত আর কোনো ঘটনা ঘটল না।

ওরা যখন ঢাকুরিতে গিয়ে পৌঁছল তখন ছুপুর তিনটে। সৌরভরা ওদের স্বাগত জানানোর জন্য ছুপুর থেকেই অপেক্ষা করছে কিন্তু এই দলে ডাক্তার-বাবুকে না দেখে অবাক হল সবাই। সমীরণ জানালো তিনি কোথায় গেছেন। অবশ্য তার দেড় ঘণ্টা পরেই ডাক্তারবাবুও এসে পৌঁছলেন ঢাকুরিতে। এই সময়টুকু ওদের কাটল ওই বিস্ময়কর মেয়েটিকে নিয়ে। সৌরভ, উৎপল, মৃণাল, দীপক এমনকি ভানুসিং বীরসিং সবাই তখন তাকে দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব ডাক্তারবাবু আসার পরও সেই গল্পই চলল বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। বিশেষ করে সুন্দরবাবার কথা শুনে প্রত্যেকেই বিস্ময়ে অভিভূত। একমাত্র লোমীর অবস্থাই তখন অন্য রকম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওই চারটে ছেলের কখনো ঘরের কোণে কখনো বাইরে কি গুজগুজ কথা চলছে সে সব দিকে ওর কোনো খেয়াল নেই। ও তখন সমানে মতলব ভেজে চলেছে। আজ রাতের মধ্যে মেয়েটির মৃত্যু ওকে ঘটাতেই হবে। তারই সুযোগের অপেক্ষায় এখন শুধু প্রহর গোণা। সজাগ শিকারীর মত দৃষ্টি। ছু মিনিটেরও সুযোগ পেলে নিশানা দাগতে এক পলক সে দেরী করবে না। কিন্তু সে সুযোগ কি আর

আসে। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার দুজনেই ওই চারটে ছেলের সঙ্গে বাইরে বা পাশের ঘরে গিয়ে কথা বলছে। কিন্তু কেউ কখনো এক সাথে নয়। মেয়েটির কাছে একজন অন্তত সদা-সর্বদাই থাকছে।

লোমী অধৈর্য্য হয়ে উঠল। তার মানে সেই মাঝরাতের আগে কিছু করা যাবে না। ভাবতে ভাবতে রাত আটটা নাগাদ সুযোগটা এল। একেবারে মোক্ষম সুযোগ।

সৌরভরা আজ রাতে একটা ভোজের ব্যবস্থা করেছে। অনেকটা ক্যাম্প ফায়ারের মত অনুষ্ঠান। সবাই মিলে এই অভিযান সফল হওয়ার আনন্দে খাওয়া দাওয়া করবে। তাই রান্না হচ্ছে টিনের মাংস দিয়ে বিরিয়ানি। রান্না করছে মৃণাল। ও নাকি রাঁধতে পারে ভাল। খাওয়া-দাওয়া হবে সৌরভদের ঘরে। এই বাংলোয় দুটো স্যুটের অবস্থান দু দিকে। অর্থাত প্রবেশ পথ দুটোর একদিকে নয়। রাত আটটার সময় ডাক্তারবাবু, সমীরণ ও লোমীর ডাক পড়ল। তিনজন তখন একই ঘরে মেয়েটির পাশে বসে।

ডাক্তারবাবু একবার বললেন—অসুস্থ মেয়েটিকে এভাবে একা ছেড়ে আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে। তোমরা বরং খেয়ে নাও আমি সমীরণ এলে পর খাব।

উৎপল তখন বলল। না ডাক্তারবাবু কয়েকমিনিটের ব্যাপারে কিছু হবে না। আপনি আসুন এক সঙ্গে খেয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবেন।

অগত্যা ডাক্তারবাবু উঠলেন।

লোমীকেও বলা হল। লোমী দেখল এ এক বিরাট সুযোগ। তবে এ মুহূর্তে সবাই চলে গেলে ও একা এ ঘরে থাকলে ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ্য দেখাবে। তাছাড়া পরে সন্দেহ যদি কিছু হয় তবে তা পড়বে তারই ওপর। তাই সেও বেরোলো ওদের সঙ্গে। অবশ্য মতলব নিয়েই।

সৌরভদের ঘরটায় এসে বসল সবাই। খাবার দাবার রান্নাঘর থেকে এনে মেঝেতে সাজানো হয়েছে। সবাই উপস্থিত। ওদের সাতজন কুলি এমন কি বাংলোর চৌকিদার পর্যন্ত। নীচে গোল হয়ে বসার আয়োজন। একমাত্র লোমীকে দেওয়া হয়েছে এক কোণে টেবিল-চেয়ারে। সবাই নীচে বসার পর লোমীও বসল ওর নির্দিষ্ট চেয়ারে। একটু অপেক্ষা করল। নিথর ওর শরীর। বুকে দ্রুত স্পন্দন। দু বার ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয়বারের জন্য মন একটু

অশান্ত হবেই। হায়েনার মত দৃষ্টি ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল চার-পাশ। সবাই এখন খাবার নিয়ে ব্যস্ত। টুক টাক কথা চলছে। ওদিকে ওপাশের স্যুটে মেয়েটি শুয়ে আছে একা। সম্পূর্ণ একা! এই সুযোগ!

লোমী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। ডাক্তারবাবু ও পরিবেশনরত উৎপলের দিকে তাকিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন। রাতের খাওয়ার আগে আমি একটা ওষুধ খাই। যদি অনুমতি দেন ওষুধটা নিয়ে আসি।

ডাক্তারবাবু খেতে-খেতে বললেন—ঠিক আছে নিয়ে আসুন।

লোমী সন্তর্পণে সবার পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরোল। নিঝুম অন্ধকার। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মৌজ করে লম্বা একটা শ্বাস নিল লোমী। আকাশে চাঁদ উঠেছে তবে একটা মেঘলা মেঘলা ভাব। তাই বাংলোটা ছাড়া চারপাশে কিছুই দেখা যায় না। পেছন দিকে একটু দূরে রান্নাঘর। সেখানে আলোর কোনো আভাস নেই। লোমী এবার ঘুরল বাঁ দিকে। একটু দ্রুত পায়েই নিজের স্যুটের দিকে পা বাড়াল।

পকেট থেকে ছোট্টো টর্চটা বের করে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে হাঁপিয়ে নিল আরেকবার। এই মেয়েটিকে হত্যা করা ওর পক্ষে খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু কেন যেন এ মুহূর্তে এইটুকু এগোতেই পা ওর ভারী হয়ে আসছে। বুকেও ঝড়ের দাপট। মগজে শব্দ হচ্ছে দপদপ। এই মেয়েটিকে মারতে না পারলে ওদের মাফিয়া জগতে একটা তোলপাড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই কি এত প্রবল উত্তেজনা। নাকি দুবার মারতে গিয়ে শেষমুহূর্তে হোঁচট খেয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না সে।

লোমী সামনের ঘরে ঢোকার আগে টর্চের আলো জ্বেলে দেখে নিল। ঘরের এক কোণে নিথর নিস্পন্দ প্রায় শয্যা শায়িনী। এবার অবধারিত ওর মৃত্যু। লোমী আপন মনে হেসে উঠল। এখানে ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই। সব এখন পাশের ঘরে খাবার নিয়ে ব্যস্ত। লোমী শিকারীর ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল এক পলক। তারপর ঝুঁকে গায়ের কম্বলটা তুলে ডান হাতের থাবাটা বাড়িয়ে দিল।

লোমী যখন মেয়েটিকে মারতে উদ্যত হল ঠিক তখন দুটি লোক ঢাকুরী বাংলোর শেষ চড়াইটা উঠতে ব্যস্ত। রাজ আর জিংমো। ওরা সেই সকাল

নটায় রওনা হয়েছে নন্দাখাত বেস ক্যাম্প থেকে। এখন রাত আটটা দশ। এখনো ওদের যাত্রা শেষ হয়নি। জিংমোর অবশ্য একদিনে এই অমানুষিক পরিশ্রম করে এতদূর আসার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাজের জন্যই আসতে হল। রাজ আর এই অভিশপ্ত এলাকায় এক সেকেণ্ডও থাকতে চায় না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে নতুন জীবনের হদিশ পেতে বড়ই উদগ্রীব।

পিঠে রুকস্যাক ও হাতে টর্চ নিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে ওরা। চরম ক্লান্তি ও অবসাদে তুজনেরই এখন পুরোপুরি ভগ্ন শরীর। তবু তো মালপত্রের বেশীর ভাগই ফেলে এসেছে নন্দাখাতের তলায়। তা না হলে একদিনে এদ্দূর কি আসা হত।

রাজ একটু দাঁড়িয়ে ওপরে বাংলোর আভাস পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ওফ্ এখনো মনে হচ্ছে কত দূর।

জিংমো বলল, আর দাঁড়িয়ো না। এটুকু একটানে চল বেরিয়ে যাই।

রাজ ক্লান্ত হাসি হেসে দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে চলল আবার। জিংমোর সঙ্গে রাজের এখন খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। রাজ ওর সব কথাই খুলে বলেছে ওকে। ওরা আসলে কে? কেন এসেছে এখানে কি আসল ঘটনা সব। জিংমো প্রথম প্রথম শুনে বেশ থমকে গিয়েছিল। কিন্তু পরে রাজের অকপট স্বীকারোক্তি ও সরলতা মাখানো বন্ধুত্ব দেখে নিজেও সহজ ও আন্তরিক হয়েছে। ওরা তুই সৈনিকের মত পাশাপাশি পা ফেলে এগিয়ে চলল।

লোমীর উদ্যত থাবাটা মেয়েটির গলায় মরণ কামড় বসানোর আগেই যা ঘটল তার জন্য বিন্দুমাত্র সে প্রস্তুত ছিল না। কম্বলটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে তুটো পেশিবহুল হাত বিত্যুতে বেগে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার একটার আঘাতে লোমীর বাঁ হাতের টর্চটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। আরেকটা হাত লোমীকে জাপটে ধরতে গেল। অলৌকিক ভয়ে লোমী প্রথমে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর একটা ঝাঁকুনি দিল সে। পুরো কম্বলটা খুলে তখন কে যেন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। অন্ধকারে লোমী কিছু বুঝতে পারল না। তুজনে ধস্তাধস্তি শুরু হল। তারপরেই বাইরের দরজা খুলে টর্চ ও বাতি হাতে হুড়মুড় করে

প্রথমে ঢুকল সৌরভরা তারপর সমীরণ, ডাক্তারবাবু ও সব শেষে ভানুসিং ও অন্যান্য কুলির দল। লোমী ওই আলোয় দেখল যার সঙ্গে লড়াই হচ্ছে ওর সে আর কেউ নয়—ওদেরই একজন প্রাক্তন কুলি অর্থাৎ যে প্রেমনাথের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল। ওর নাম গোরাসিং। লোমী ততক্ষণে ওর আক্রমণ প্রায় রুখে ফেলেছে। বাঁ হাতে গোরাসিংকে আঁকড়ে ধরে ডান হাতে সে প্যাণ্টের পেছনের খোপ থেকে ওর অটোমেটিক পিস্তলটা বের করতে গেল। উৎপল সেটা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর ভানুসিং ও বীরসিংও। কিন্তু লোমী হল আন্তর্জাতিক অপরাধ জগতের এক শিরোমণি। ওর সঙ্গে কি ওরা পারে? মুক্ত পায়ে এমন এক প্যাঁচ দিল সবাই ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। অবশ্য তার মধ্যে উৎপল একটা কাজের কাজ করে ফেলল। লোমীর পকেট থেকে আধাআধি বেরোনো পিস্তলটাকে সে ছিনিয়ে নিল। পিস্তলটা নিয়েই এক মুহূর্ত কি ভেবে তীব্র বেগে ছুটে পালাল বাইরের অন্ধকারে—যাতে লোমী আবার ওটার দখল নিতে না পারে। এমনিতে পিস্তল চালাতে তো আর উৎপলরা কেউ পারে না। লোমী ওর পেছু নিতে গিয়ে আবার বাধা পেল গোরাসিং-এর কাছে। ভানু সিং ও বীর সিংও তখন রুখে দাঁড়িয়েছে। লোমীর হাতে এবার ধারালো একটা লম্বা ছুরি চকচক করে উঠল। এও এক বিশেষ ধরনের ছুরি ট্রিগার, টিপলে তার তীক্ষ্ণ ফলাটা সবেগে আট-ইঞ্চি মত বেরিয়ে আসে বাইরে। শত্রুকে আক্রমণ করে আবার সেটা ঢুকে যায় ভেতরে। লোমী এমনিতেই ছুরি চালাতে ওস্তাদ। তারপর এই অভিনব ছুরি। নিমেষেই সে গোরা সিং ভানু সিং ও বীর সিং তিনজনকেই ঘায়েল করল। একজনের ডান হাতের বাহুতে বিঁধল ওটা, আরেক জনের বাঁ হাতের চেটোয়, আরেক জনের উরুতে। রক্তে লাল হয়ে গেল সবার জামা কাপড়। তিনজনেই যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছে। লোমী এবার ক্ষিপ্র গতিতে ঘরের এক পাশে রাখা ওর ব্যাগের কাছে গিয়ে বের করল আরেকটা পিস্তল। ডাক্তারবাবু সমীরণ মৃণাল দীপক সবার তখন দিশেহারা অবস্থা। কি করবে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। তার মধ্যে দীপক তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। লোমী ওর উদ্যত পিস্তল নিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে গেল।

দীপকের শার্টের কলারে তীব্র মোচড় দিয়ে কর্কশ স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, —বল রে ছোঁড়া মেয়েটা কোথায়?

দীপক পিস্তলের বাঁটটা বুকে ঠেকাতেই শিউরে উঠে বলে ফেলল—আমাদের ঘরে—বাথরুমের পাশের কামরাটায় আছে।

লোমী আর কোনো কথা নয়, হাতে পিস্তল নিয়ে ছুটে গেল বাইরে।

সৌরভ-মৃণাল দীপককে ধিক্কার দিয়ে বলল, এ কি করলি তুই!

দীপক কেঁদে ফেলল। ওদের দিকে ঘুরে বলল, পারলাম না। প্রাণের ভয়ে আর পারলাম না রে।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ বিস্মিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোমীকে পাশের স্যুটের দিকে যেতে দেখে এবার তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। ছুটে বেরোলেন ঘর থেকে। পেছন পেছন সমীরণ সৌরভ ও মৃণাল। অবশ্য তার আগেই দুটো গুলির শব্দ স্তব্ধ এলাকাটাকে খান খান করে দিল। একটা চাপা আর্তনাদের পর সব আবার থমথমে হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুরা বেরিয়ে দেখলেন, সৌরভদের ঘরের পাশে লোমী ও তার কিছু পেছনে আরেকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দুজনেরই নিস্পন্দ দেহ।

এই দ্বিতীয় জন হল রাজ। রাজ আর জিংমো একটু আগেই পৌঁছেছিল সেখানে। তখন উৎপল লোমীর পিস্তল হাতে বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে চলেছে লোমীর ওই তুলকালাম কাণ্ড। রাজ আর জিংমোকে দেখে উৎপল তখন ওদের সাহায্য পাওয়ার জন্য সব কথা সংক্ষেপে ওদের খুলে বলে। রাজ সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নেয়। কারণ কিছুটা সে প্রেমনাথের মুখে শুনেছিল! নিজের অস্ত্র-শস্ত্র সব সে পিণ্ডারির খাদে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে। তাই উৎপলের কাছ থেকে লোমীর পিস্তলটা নিয়েই সে এগিয়ে যায়। লোমী তখন মেয়েটিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সৌরভদের স্যুটে ঢুকছে। রাজ পেছন থেকে গিয়ে থামতে বলে ওকে। লোমী ঘুরেই গুলি চালিয়ে দেয় ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজও ট্রিগার টেপে ওর পিস্তলের। দুজনেই তারপর লুটিয়ে পড়ে সেখানে।

সে রাতটা আর ভালভাবে কাটল না কারো। গোরা সিং ভানু সিং ও বীর সিং-এর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ডাক্তারবাবু ও সমীরণ মেয়েটির পাশেই বসে রইলেন সারা রাত।

ক্ষুধার্ত জিংমোকে কিছু খাইয়ে সৌরভরা ডাক্তারবাবুদের স্যুটে গিয়েই

ঢুকল। লাশ দুটো তখনও সেখানেই পড়ে আছে। বাংলোর চৌকিদার বলল ও খুব ভোরে বেরিয়ে ভারারির পুলিশকে খবর দেবে। তারপর ওরা যা করে করবে।

জিংমো ওর কথা বলল সৌরভদের। কি উদ্দেশ্যে ডেভিডরা ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে ও রাজ ওকে আসল কথা কি বলেছে সব। মেয়েটির হারটাই যে এসবের মূলে শুনে সবাই থ। হারটা ওরা প্রত্যেকেই দেখেছে। এমন কিছু দামী হার নয়। তাহলে কেন তাকে ঘিরে এত সব তোলপাড় কাণ্ড? তারপর জিংমো ওদের জিজ্ঞেস করল, কি ঘটেছিল এখানে? এই মেয়েটি এখানে কি ভাবে এল? লোমীই বা এত হিংস্র হয়ে উঠেছিল কেন?

উৎপল ওকে সংক্ষেপে বলল সব। ওদের নিজেদের কথা, মেয়েটির কথা তারপর গোরাসিং-এর কথা। আসলে গোরাসিং-ই মেয়েটির প্রাণ রক্ষা করল। গোরাসিং ঠিক কুলি নয় সে হল ট্রেকিং গাইড। কিছুটা শিক্ষিত। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ইংরেজিও অল্প বিস্তর বোঝে। তবে থাকে গোবেচারার মতই। প্রেমনাথকে নন্দাখাত বেস ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে সে কালই খাতিতে ফিরে এসেছিল। তারপর আজ সকাল দশটার মধ্যে ঢাকুরী। ওর কাছ থেকেই সৌরভরা জানতে পারে যে প্রেমনাথ সব মিথ্যে বলেছে ওদের। আসলে সে ডেভিডদেরই লোক। নন্দাখাত বেস ক্যাম্প থেকে চলে আসার আগে লুকিয়ে তাঁবুর ভেতর রাজের সঙ্গে ওর কিছু কিছু কথাবার্তা শুনেছে গোরাসিং। তাতে ও এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে এই মেয়েটির জন্যই ওরা দল বেঁধে এসেছে এখানে। ঠিক কি কারণ আঁচ না পেলেও উদ্দেশ্য যে বদ সেটা স্পষ্ট। প্রেমনাথের সঙ্গী সাহেবটি যে সে জন্যই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে এখন আছে সেটাও গোরাসিং টের পেয়েছে। ভানুসিং গোরাসিং-এর প্রিয় বন্ধু। তাই ওকেই সব কথা খুলে বলার জন্য সে ছুটে আসে এখানে। ওর মুখে এই সব কথা শুনে সৌরভরা, ডাক্তারবাবু ও মেয়েটির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন উৎপল সিদ্ধান্ত নেয় যে ওদের এ মুহূর্তে খাতির দিকে রওনা হওয়া উচিত। প্রথম, ডাক্তারবাবুকে সাবধান করতে দ্বিতীয় লোমীর ওপর নজর রাখতে। ভাবামাত্র ও আর মৃণাল ভানুসিং বীরসিং-এর এক জোড়া বাড়তি পোশাক পরে ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। খাতির আধা আধি রাস্তা এসে ওরা যখন দেখতে পায় যে মেয়েটির শয্যা নিয়ে

সব এদিকেই আসছে তখন পথের ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে দুজন। তারপর ওরা এগোতেই আবার ওদের পেছু নেয়। তখনই ওরা লক্ষ্য করে যে ডাক্তারবাবু দলে অনুপস্থিত।

কিছুদূর এসে সমীরণ প্রকৃতির ডাকে মেয়েটির শয্যা নামিয়ে যখন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তখন মৃণাল ওর পেছু নেয়। আর উৎপল লোমীর দিকে লক্ষ্য রাখে। ওর জন্যই লোমী সেখানে মেয়েটিকে মারতে গিয়ে শেষমুহূর্তে মারতে পারল না। এদিকে মৃণালও সমীরণকে জঙ্গলে লোমীর কথা বলে ওকে সাবধান করে দেয়। তারপর ওরা ঢাকুরীর দিকে চলে আসে। ঢাকুরী বাংলোয় সমীরণরা পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবুও এসে পড়েন। তাঁকে সৌরভরা বলে লোমীর বদ উদ্দেশ্যের কথা। কিন্তু ভালোমানুষ ডাক্তারবাবু এসব কথা বিশ্বাস করেন না। ছেলেমানুষি সন্দেহ বলে উড়িয়ে দেন। তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার জন্য ও লোমীকে হাতে নাতে ধরার উদ্দেশ্যে উৎপল ও সমীরণ মিলে একটা পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকেলের দিকে লোমী যখন একবার বাথরুমে ঢোকে তখন মেয়েটিকে ওরা পাশের স্যুটের একেবারে পেছনদিকের কামরায় সরিয়ে নিয়ে যায় ও গোরাসিংকে ওর কম্বল গায়ে দিয়ে শুইয়ে দেয় সেখানে।

তারপরের কথা পাঠকরা সব জানেন। এর পরের কাহিনী খুব বেশী নেই। তবে হ্যাঁ ঘটনা এর পরেও ঘটেছে। এবং সেটাই মর্মান্তিক।

ডাক্তারবাবু যথারীতি খুব যত্ন সহকারে মেয়েটিকে নিয়ে একেবারে বাগেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সৌরভরাও ভারারি থানায় গিয়ে ওদের এজাহার দিয়েছিল। দিল্লীর আমেরিকান কনস্যুলেট সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েটিকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসে দিল্লীর এক প্রখ্যাত নার্সিং হোমে। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসার পর ওরা ওকে বিশেষ এক প্লেনে উপযুক্ত সুরক্ষার সঙ্গে ওয়াশিংটন অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু মাঝপথে সেই বিমান এক শক্তিশালী টাইম বোমের বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়। মেয়েটি আর জীবিত অবস্থায় আমেরিকায় ফিরে যেতে পারে না। বলাবাহুল্য এসবই সেই অসীম প্রভাবশালী মাফিয়া দলের কাজ।

সেই মাইক্রো ফিল্ম ও মেয়েটির সর্বনাশ করে ওরা আজও আমেরিকায় তাদের অসামাজিক কার্য্য কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

শেষ